চয়নিকা

(An Advanced Course Reader in Bengali)

সম্পাদনা :
বকুল চন্দ্র চৌধুরী

ভারতীয় ভাষা সংস্থান, মহীশূর
মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রণালয়, শিক্ষাবিভাগ
ভারত সরকার

চয়নিকা

(An Advanced Course Reader in Bengali)

CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES

Publications in Major Indian Language : Bengali-2.5

Supervision

P.N. Dutta Baruah

চয়নিকা

(An Advanced Course Reader in Bangali)

সম্পাদনা :

বকুল চন্দ্র চৌধুরী

ভারতীয় ভাষা সংস্থান, মহীশূর

মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রণালয়, শিক্ষাবিভাগ

ভারত সরকার

Chayanika, An Advanced Course Reader in Bengali,
compiled and edited by Dr. Bakul Chandra Chowdhury

First Published November1996
Pausa 1918

Price : Rs. 63.00
$ 6.00
£ 4.00

ISBN 81-7342-

Published by Dr. Francis Ekka, Director,
Central Institute of Indian Languages, Manasagagotri,Mysore - 570 006.

Printed by Mr. S.K. Biswas, Manager,
CIIL Printing Press, Manasagangotri, Mysore - 570 006.

Production Assistance : Mr. K. Srinivasacharya

FOREWORD

The Central Institute of Indian Languages from its very inspection in 1969 has been working in theoretical and applied aspects of linguistics in its headquarters at Mysore and its seven Regional Language Centres in Mysore, Bhubaneshwar, Pune, Patiala, Solan, Lucknow, and Guwahati. The main function of the Regional Language Centres is to impart in-service training to graduate teachers in 13 major Indian languages other than their mother tongues with the expectation that the trained teachers should able to impart instruction in such languages learnt by them to school children under the scheme of *implementation of three language formula*. The task is tremendous in that it necessitates a very thorough and intensive training including language teaching methods, preparation of language instructional materials, techniques of evaluation and testing, and the like.

In the fulfillment of this responsibility the Institute has been taking up the preparation and publication of a series of Phonetic Readers, Grammars and Dictionaries in the tribal languages and another series of second language teaching materials in 18 major Indian languages which include Script Books, Pictorial Glossaries, Common Vocabularies, Phonetic Readers, Intensive Courses, Intermediate and Advanced Course Readers and school level language Primers.

These books have been well received by the students, scholars, Government and Non-government agencies both in India and abroad. The Institute has been receiving requests from various agencies under both Central and State in India and some agencies abroad to prepare innovative language teaching and reserach materials in both mother tongue and second language which include computerised *data base* in Indian languages and computerised *Dictionaries* and *Grammers*.

The present book entitled 'Chayanika' is the Advanced Course Reader in Bengali. It aims at giving the learners the taste of the representative samples of literature in Bengali. The editor Dr. Bakul Chandra Chowdury has carefully chosen pieces of prose, poetry and drama from the representative samples of writings by reputed writers of the current century. In addition to representing various literary styles and rich diction, these pieces also present

the cultural background of the Bengali people. The editor has prepared various kinds of subjective as well as objective exercises for each lesson so as to strengthen the language skills of the learners and also has given cultural notes for the enrichment of knowledge of Bengali culture by the non-natives.

It is hoped that this book will fully meet the needs of the learners of Bengali as a second language. It may even serve as a good text book or a reference book for teaching Bengali in the secondary school level under CBSE courses. The editor, the supervisor and the Institute will feel rewarded if the book is well received by the learners and teachers of Bengali.

MYSORE
November 30, 1996

FRANCIS EKKA
Director

সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
Acknowledgement		viii
ভূমিকা		ix
১। বিনয়-বাদল-দীনেশ	বিশু মুখোপাধ্যায়	1
২। মাষ্টার মহাশয়	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	7
৩। শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর	বিষ্ণুপদ পাণ্ডা	18
৪। বল বল বল সবে (কবিতা)	অতুলপ্রসাদ সেন	25
৫। পিতৃভক্তি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	29
৬। আশ্বিনের ঝড়	শিবনাথ শাস্ত্রী	38
৭। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম	শ্রীবরেন্দ্রনাথ রায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	45
৮। অভাগীর স্বর্গ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	54
৯। জন্মভূমি (কবিতা)	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	67
১০। হিমালয় ভ্রমণ	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	71
১১। সরল থীসিস প্রণালী	প্রমথনাথ বিশী	80
১২। সাগর সঙ্গমে নবকুমার	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	89
১৩। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার (কবিতা)	কাজী নজরুল ইসলাম	98
১৪। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য	বকুল চন্দ্র চৌধুরী	102
১৫। রামমোহন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	111
১৬। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়	সাগরময় ঘোষ (সম্পাদকীয় 'দেশ' পত্রিকা)	117
১৭। ভারততীর্থ (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	122
১৮। বর্তমান ভারত	স্বামী বিবেকানন্দ	127
১৯। মনুষ্য ফল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	133
২০। লেখক পরিচিতি	বকুল চন্দ্র চৌধুরী	143

ACKNOWLEDGEMENT

I wish to thank the following organisations and individuals for granting permission to publish the topics selected for the "CHAYANIKA", an Advanced Reader in Bengali :

- Sri Jagadindra Bhowmik, Visva-Bharati (Publication Department) for R.N. Tagore's "Bharat Tirtha" and "Ram Mohan."
- Sri Sagarmay Ghose for "Swadhinatahinotay Ke Bancite Cay " Editorial "Desh".
- M.C. Sarkar & Co., Calcutta for Sarat Chandra Chattopadhyay's "Abhagir Swarga".
- Sri Amulya Gopal Mazumder, D.M. Library for Kazi Nazrul Islam's "Kandari Hunshiar".
- Dr. Bishnupada Panda for "Shikkhabrati Vidyasagar".
- Sri S.N. Roy, Mitra and Ghose, Calcutta for Pramatha Nath Bishi's "Saral Thesis Racana Pranali".
- Shyamapada Dutta, Nabankur Prakashani, Calcutta for Ashutosh Bhattacharjee and Barendra Nath Roy's "Bharater Swadhinatar Sangram".
- Sri Jayanta Basu, Indian Associated Publishing Co. (p) Ltd. for 'Binoy, Badal, Dinesh'.

I am also thankful to those by whose writings this volume became enriched.

Further I consider it as a proud previlege to express my gratitude to the following personalities :

- Dr. E. Annamalai for providing me an opportunity to do this work.
- Dr. P.N. Dutta Baruah for his advice, supervision and copy-editing of this work as a whole.
- Dr. S.N. Barman for his co-operation and encouragement.
- Dr. Asish Kr. Dey of Vidyasagar University and Dr. Mina Dan of Calcutta University without whose active help this volume could not have got this form.
- Smt. Sankari Chowdhury for taking the trouble of correcting the entire manuscript.
- Dr. Mrityunjoy Das and Smt. Annapurna Misra for their help both active and passive.
- Sri S.K. Biswas and my other colleagues of the press for their help and co-operation.

Bakul Chandra Chowdhury

Editor

ভূমিকা

মহীশূরে অবস্থিত ভারতীয় ভাষা সংস্থান ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠান ত্রিভাষী সূত্র কার্যকরী করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার শিক্ষাদানের যে ব্রত গ্রহণ করেছে, বর্তমান 'চয়নিকা' হলো তারই অন্তর্গত বাংলা ভাষা প্রশিক্ষণের একটি পাঠ্যক্রম । অবাংলাভাষী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিমূলক লেখা বিভিন্ন অনুশীলনী সহ 'চয়নিকা'তে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে । এই সঙ্কলনটি পড়ার আগে প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলা ভাষায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের জ্ঞান থাকা নিতান্তই প্রয়োজন । এটি বিশেষতঃ ভারতীয় ভাষা সংস্থান দ্বারা পরিচালিত প্রায় এগারশ ঘণ্টার ডিপ্লোমা (সনদ) পাঠ্যক্রমের শেষ পর্যায়ের সাড়ে তিনশ ঘণ্টার পাঠ্যক্রম । এর মাধ্যমে প্রথম দুটি স্তরে আহরণ করা শ্রবণ, পঠন, লিখন ও কথন - ভাষা শিক্ষার এই চারটি দক্ষতার পরিপুষ্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

এই সঙ্কলনের কাঠামো এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা পুস্তকটির পাঠ সমাপনান্তে নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, যেমন, বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত দৈনন্দিন জীবনের ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কথাবার্তা, সম্ভাষণ, সমালোচনা ইত্যাদি বুঝতে ও অন্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে কোন রকম অসুবিধে হবে না । অর্থাৎ তাঁরা যে কোনও ভাবের আদান প্রদানে সক্ষম হবেন । কোনও গল্প পড়ে বা ছবি দেখে তার সারাংশ বা সমালোচনা লিখতে পারবেন । আর পারবেন সাবলীল ভাবে কোনও রচনা লিখতে ।

এই সঙ্কলিত পুস্তকে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকের কবিতা ও গল্প স্থান পেয়েছে । এছাড়াও এতে আছে উপন্যাস ও নাটকের অংশবিশেষ, জীবনী ও আত্মজীবনী মূলক রচনা, ভ্রমণ-কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ আর একটি সম্পাদকীয় । এভাবে বিভিন্ন শৈলীর রচনার মাধ্যমে বৈচিত্রের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে । এখানেই 'চয়নিকা' অন্যান্য মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক থেকে ভিন্ন বা বিশিষ্ট । প্রত্যেকটি

পাঠের শেষে দেওয়া বিভিন্ন ধরণের অনুশীলন ছাত্র ছাত্রীদের 'হাতে করা এবং শেখা'র আনন্দ প্রদান করবে ।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরল থেকে জটিল এবং জানা থেকে অজানার দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া শিক্ষাবিধির মৌলিক প্রয়োজনীয় কথা । ভাষা শিক্ষার এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে যেসব রচনা লেখা হয়নি, সেসব রচনাকে স্তরের ক্রম বিন্যাস করে সাজানো খুব একটা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয় । তবুও এই সঙ্কলনের পরিকল্পনা কালে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে ।

এই সঙ্কলনের নির্বাচন এমন ভাবে করা হয়েছে যে, যদি কোনও উৎসাহী প্রশিক্ষণার্থী সে বিষয়ে আরও অগ্রসর হতে চান তাহলে তিনি স্বল্প পরিশ্রমেই প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পুস্তকাদি সহজেই পেতে পারেন । এই পুস্তক পড়ার সময় পাঠগুলো যে ক্রমান্বয়ে পড়ে যেতে হবে তেমন কোনও বাধ্য বাধকতা নেই । প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী অথবা প্রয়োজন বশতঃ অধ্যাপকের সহায়তায় যে কোনও বিষয়ই পড়তে পারেন । প্রত্যেকটি পাঠের প্রথমেই পাঠ্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দেওয়া হয়েছে এবং তার পরেই রয়েছে দুরূহ শব্দার্থের তালিকা । পাঠান্তে পাঠ্য বিষয়ের ওপর রয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নাবলী, ব্যাকরণ সম্পর্কীয় ও সংস্কৃণি-মূলক প্রশ্ন । অবশেষে লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী-মূলক বিবরণ দিয়ে পুস্তকটি সমাপ্ত করা হয়েছে ।

ভারতীয় ভাষা সংস্থানের বাইরে অবাঙালী এলাকায় স্কুলে যারা বাংলা শিখছেন তাঁরাও 'চয়নিকা' পড়ে উপকৃত হতে পারবেন ।

পরিশেষে বলি,এই পুস্তকের সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীরা যদি বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে পারেন বা তা জানবার জন্য অধিক কৌতূহলী ও আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাহলেই আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি ।

৩০ শে নবেম্বর ১৯৯৬
মহীশুর

বকুল চন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক

পাঠ - ১

বিনয়-বাদল-দীনেশ

প্রস্তাবনা :

এটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণমূলক রচনা। এই রচনার লেখক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানতঃ শিশু সাহিত্য রচয়িতা হিসেবেই পরিচিত। দীর্ঘদিন ''মৌচাক'' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ''দৈনিক বসুমতী''র ছোটদের পৃষ্ঠাটি তিনিই সম্পাদনা করতেন। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবেও ইনি সুপরিচিত। এঁর উল্লেখযোগ্য বই ''বিখ্যাত দস্যু কাহিনী।''

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়। তার প্রায় ১৫০ বছর পর ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার শপথ নিয়ে বিনয়, বাদল ও দীনেশ এই তিন তরুণ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই রচনায় তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শব্দ সম্ভার :

নির্যাতন	অত্যাচার
উদ্বুদ্ধ	অনুপ্রাণিত
পীড়ন	নির্যাতন
শৃঙ্খল	শেকল

মোচন	দূর
অম্লান	অমলিন
দর্পিত	অহংকারী
চকিত	হঠাৎ
ক্লেশ	দুঃখ
স্পৃহা	ইচ্ছা
স্মৃতি	পুরোনো দিনের মনের ছবি
ম্লান	মলিন
ভাস্বর	উজ্জ্বল
শঙ্কিত	ভীত
বিভ্রান্ত	কি করবে, কি না করবে ঠিক করতে না পারা, বিচলিত
ভ্রুক্ষেপ	নজর, দৃষ্টি
ভয়ংকর	ভীষণ
দৃঢ়সংকল্প	বদ্ধপরিকর, কোন কাজ করতে স্থির প্রতিজ্ঞ
আত্মোৎসর্গ	জীবন উৎসর্গ
পরোয়ানা	সমন, ডাক
আস্ফালন	আত্ম-দাম্ভিকতা প্রকাশ
উপায়তর	অন্য কোন উপায়
মৃত্যুঞ্জয়ী	মৃত্যুকে জয় করেছে
দেশমাতৃকা	দেশমাতা

মূলপাঠ :

প্রায় দুই শত বৎসর বৃটিশ শাসকদের নির্যাতন সহ্য করিবার পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে অনেক ত্যাগ, অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। বৃটিশ রাজশক্তি দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতার জ্বলন্ত স্পৃহা দমন করিতে পারে নাই।

অসংখ্য দেশপ্রেমিকদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া আসিয়াছে ভারতের স্বাধীনতা। এরূপ দেশপ্রেমিক সন্তানদের মধ্যে বিনয়, বাদল ও দীনেশের নাম আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহাদের দুঃসাহসিক, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী যে যে কোন দেশপ্রেমিককে উদ্বুদ্ধ করিবে তাতে সন্দেহ নাই । তাঁহাদের স্মৃতিকে শাশ্বতকাল স্মরণীয় করিবার জন্যই ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করিয়া 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ' রাখা হইয়াছে ।

সে সময় ভারতবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ শক্তি দমনমূলক শাসন ব্যবস্থা চালাইয়াছিল । ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খাকে চিরতরে ম্লান করিবার জন্য রাজশক্তি যেন দৃঢ়সংকল্প । এদিকে ভারতবাসীও তাহাদের দমনকে, রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করিয়া, অসহ্য পীড়নকে হাসিমুখে বরণ করিয়া, 'জীবন-মরণকে পায়ের ভৃত্য' করিয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে হইয়াছিল বদ্ধপরিকর । শুধুমাত্র যুবকেরা নহে, দেশের তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়ও এই বিষয়ে পিছাইয়া ছিলেন না । তরুণ ক্ষুদিরাম দেশের জন্য হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে 'জীবনের জয়গান' গাহিলেন । তাঁহার এই আত্মোৎসর্গ পরবর্তীকালে অগণিত তরুণের মনে দেশপ্রেমের জোয়ার আনিল । তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া বহু তরুণ দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য জীবনদান করিলেন । বিনয়, বাদল ও দীনেশ ছিলেন এইরূপ তিন তরুণ । এই ত্রয়ী অগ্নিযুগের তিনটি নক্ষত্র - চির অম্লান, চির ভাস্বর ।

সেদিন মাত্র তিনটি তরুণ বঙ্গসন্তানকে দমন করিতে মহাশক্তিশালী ইংরেজ সরকারকে গোরা পুলিশ ও গুর্খা সৈন্যদের তলব করিতে হইয়াছিল । এই বীরদের পদক্ষেপে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল রাইটার্স বিল্ডিং । এই তিনটি তরুণের সংহার মূর্তি দেখিয়া তৎকালীন সশস্ত্র পুলিশদলও শঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হইয়াছিল ।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর, রাইটার্স বিল্ডিং এর সামনে গাড়ি হইতে নামিলেন তিনটি তরুণ । কারা বিভাগের প্রধান সিম্পসন সাহেবের অফিস এখানে । বলদর্পী ঐ ইংরাজ শাসকের অত্যাচারের অন্ত ছিল না । বিপ্লবীদের নিকট অত্যাচারীর ক্ষমা নাই, আজ তাই প্রধান লক্ষ্য তিনিই । তাঁহারই মৃত্যুর পরোয়ানা লইয়া তিন তরুণ হাজির ।

বিনয় ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র । তিনিই ছিলেন দলনেতা। মাত্র তিন মাস আগে ঢাকার ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ল্যাম্যান সাহেবকে তিনিই দিয়া আসিয়াছেন চরম শিক্ষা । আজ সিম্পসন সাহেবের পালা ।

বাদল তখন মাত্র ১৮ বৎসরের বালক । সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলন্টিয়ার্সের লেফটন্যান্ট।

দীনেশ তখন মাত্র ২০ বৎসরের বালক । মেদিনীপুরের বিপ্লবী সংগঠনের তিনি ছিলেন প্রাণ ।

সিম্পসন সাহেবের ঘরে ঢুকিয়াই তাঁহারা একসঙ্গে গুলি করিলেন । দর্পিত সাহেবের কোন আস্ফালন প্রকাশ পাইবার পূর্বেই তাঁহার জীবন-দীপ নিভিয়া গেল ।

ইতিমধ্যে লালবাজারে খবর পৌঁছিয়াছে । পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ছুটিয়া আসিলেন । সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী । কিন্তু দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আগুনের কাছে সমস্ত বাধা তুচ্ছ । পুলিশের দল হার মানিল । তিন বীরের গুলির আঘাতে অনেক অফিসার ইতিমধ্যে ধরাশায়ী । সশস্ত্র পুলিশ তাদের গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটিতে পারিল না । অবশেষে উপয়ান্তর না দেখিয়া ডাকা হইল গুর্খা বাহিনীকে । শুরু হইল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দায় । এই যুদ্ধই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে সুপরিচিত। যুদ্ধ চলিতেছে কখনও এ বারান্দায় কখনও সে বারান্দায় । আর মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠিতেছে - 'বন্দে মাতরম্ ।'

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, হঠাৎ একটি গুলি আসিয়া লাগিল দীনেশের পিঠে । কিন্তু তাঁহার সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই । তাঁহাদের তখন একমাত্র চিন্তা - হয় জয়, নয় মৃত্যু ; 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ।' এদিকে তাঁহারা একটি শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ।

'সময় হয়েছে, এবার বাঁধন খুলতে হবে ।' এবার এই পৃথিবী হইতে তাঁহাদের বিদায় লইবার পালা । জীবন্ত ধরা দেবেন না তাঁহারা । সঙ্গে ছিল চকিত-মৃত্যুর দাওয়াই 'পটাসিয়াম সায়ানাইড ।' তাহা মুখে দিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাদল মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। দীনেশ আর বিনয় এইবার রিভলবার দিয়া নিজেদের মাথায় গুলি করিলেন । দরজা ভাঙিয়া পুলিশ আসিয়া তাঁহাদের অচেতন দেহ তিনটিকে তুলিয়া লইল ।

পাঁচদিন জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িয়া বিনয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ১৩ই ডিসেম্বর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ।

দীনেশের মৃত্যু কিন্তু অত সহজে হইল না । একটু সুস্থ হইতে বিচারালয়ে তাঁহার বিচার শুরু হইল আর এই বিচারের ফল যে অবধারিত মৃত্যু, তাহা তো সকলেরই জানা ।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই দীনেশের ফাঁসি হইল আলিপুর জেলে ।

তাঁহাদের এই অসীম বীরত্বের কাহিনী লোকমুখে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হইল । কোটি কোটি ভারতবাসীর কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হইল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী -

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই ।'

বিনয়-বাদল-দীনেশ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনটি শ্বহীদ । তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ী ।

অনুশীলনী :

১। 'এই যুদ্ধই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অলিন্দ যুদ্ধ নামে সুপরিচিত ।'

ক) এই অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক কারা ?

খ) এই অলিন্দ যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল ?

গ) কেন এই যুদ্ধ অলিন্দ যুদ্ধ নামে সুপরিচিত ?

ঘ) কাকে মারবার জন্য এই যুদ্ধের নায়করা বদ্ধপরিকর ছিলেন ?

ঙ) গুলি শেষ হয়ে যাবার পর ওরা কি করলেন ?

২। বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের আগের নাম কি ছিল ?

৩। 'বন্দে মাতরম্' শব্দের অর্থ কি ? এই মন্ত্রের স্রষ্টা কে ?

৪। 'সময় হয়েছে, এবার বাঁধন খুলতে হবে' - কারা কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিল?

৫। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) 'হয় জয়, নয় মৃত্য - মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ।'

খ) 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই ।'

৬। শব্দার্থ লিখুন :

নির্যাতন, দুঃসাহসিক, উদ্বুদ্ধ, দৃঢ়সংকল্প, ত্রয়ী, ভাস্কর, পদক্ষেপ, সংহার, মূর্তি, বলদর্পী, অলিন্দ, ধরাশায়ী, ভ্রূক্ষেপ, মৃত্যুঞ্জয়ী

৭। বাক্যরচনা করুন :

আত্মোৎসর্গ, পরাধীনতা, উপায়ন্তর, স্বাধীনতা, অম্লান, পবিত্র, সশস্ত্র

৮। প্রবন্ধের কথা বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

ক) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ________ ডিসেম্বর ________এর সামনে গাড়ি হইতে নামিলেন তিনটি তরুণ। কারা বিভাগের প্রধান ________ সাহেবের অফিস এখানে। বিপ্লবীদের নিকট ________ ক্ষমা নাই, আজ তাই প্রধান লক্ষ্য। ________ তাঁহারই মৃত্যু________ লইয়া তিনি হাজির।

খ) বিনয় ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ________ শ্রেণীর ছাত্র। তিনিই ছিলেন ________ মাত্র তিন মাস আগে ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ________ সাহেবকে তিনিই দিয়া আসিয়াছেন ________ ।

গ) বাদল তখন মাত্র ________ বৎসরের বালক। সুভাষচন্দ্রের ________ লেফটেন্যান্ট। দীনেশ তখন প্রায় ________ বৎসরের ________ । মেদিনীপুরের বিপ্লবী ________ তিনি ছিলেন ________ ।

পাঠ - ২

মাষ্টার মহাশয়

প্রস্তাবনা :

এটি একটি হাস্যরসসিক্ত ছোট গল্প । এই গল্পের লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতের একটি সুপরিচিত নাম । তার জন্ম ১৮৭৩ সালে ও মৃত্যু ১৯৩২ সালে। প্রথম জীবনে তিনি 'রাধামনি দেবী' এই ছদ্মনামে লিখতেন । প্রভাতকুমার তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকে কবিতাও লিখতেন কিন্তু পরে তা ছেড়ে দেন । তাঁর সাহিত্য কর্মের উজ্জ্বলকীর্তি তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পের সম্ভার । তাঁর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ভাষার সারল্য, স্নিগ্ধ ও কৌতূকপূর্ণ প্রকাশ ভঙ্গী, এবং বিষয়বস্তুর বাস্তবতা । তিনি সরল সাধু বাংলায় লিখতেন । তাঁর রচনার বিষয়বস্তু আমাদের চারপাশের পরিচিত সংসারের বাস্তব ঘটনা সমূহ ।

তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'মনের মানুষ', 'প্রতিমা' ইত্যাদি উপন্যাস এবং অসংখ্য সার্থক ছোটগল্প ।

বাংলাদেশে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার শুরু হল তখন বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সাধারণ লোকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন । সেই প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে একজন অল্পশিক্ষিত শিক্ষক কেমন করে নিজের বুদ্ধির জোরে একজন দক্ষ শিক্ষককে হার মানিয়ে নিজেকে জ্ঞানী শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন - তারই একটি কৌতুকপূর্ণ চিত্র লেখক এ গল্পে পরিবেশণ করেছেন ।

শব্দ সম্ভার :

অভিভাবক	তত্ত্বাবধায়ক
নির্বাহ	সমাধা, চালানো
যাত্রা	রওয়ানা
নিযুক্ত	বহাল, রত
মোড়ল	গ্রামের মুখ্য
হেঁট	নিচু
ক্রোশ	দুই মাইলের কিছু বেশী
বারোয়ারী	সর্বজনীন
ঢপওয়ালী	এক ধরণের নর্ত্তকী
জ্বর বিকার	প্রবল জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় আবোল তাবোল কথা বলা
পরাভব	পরাজয়
কোলাহল	হট্টগোল
কিঞ্চিদধিক	অল্পবেশী
দণ্ডায়মান	দাঁড়িয়ে থাকা
পার্শ্ববর্তী	পাশের
কিয়ৎক্ষণ	কিছু সময়
খর্বাকার	বেঁটে
প্রত্যাখ্যান	ফেরৎ
পঙ্গপাল	একপ্রকার পোকা
হুঁকা	তামাক খাবার যন্ত্র
পরামর্শ	বুদ্ধি
বায়না	অগ্রিম টাকা
হটে	পিছিয়ে যাওয়া
পো	ছেলে
হপ্তা	সপ্তাহ

বর্ধিষ্ণু	যা বেড়ে চলেছে
ধুমধাম	মহাসমারোহ
খ্যাতিসম্পন্ন	নাম করা
রোয়াক	বারান্দার অংশ বিশেষ
আড়ত	গোলা
পাংশুবর্ণ	ছাই রঙের
পঞ্চাশত	পঞ্চাশ
মাতব্বর	নেতা, দলপতি
গুপ্তচর	যে লুকিয়ে সংবাদ আনে
অভূতপূর্ব	যা আগে হয় নি
কৃশকায়	রোগা
আক্কেল গুড়ুম	হতবুদ্ধিতা
ইংরাজী নবীশ	ইংরেজী জানা
শ্রুতিগোচর	কানে শোনা

মূল পাঠ :

কিঞ্চিন্দধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে, বর্ধমান শহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল । উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল । এখন সে গ্রাম দুখানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য - দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে । ফাল্গুন মাস, এক প্রহর বেলা হইয়াছে । গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক স্থানীয় কায়স্থ সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধুমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুজ্যে ও কেনারাম মল্লিক নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপ ভাবে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন । পার্শ্ববর্তী নন্দীপুরেও প্রতি বৎসর চাঁদা করিয়া ধুমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে । এ বৎসর গুজব শুনা যাইতেছে যে উহারা অন্যান্য বৎসরের মত যাত্রা ত আনিবেই ; অধিকন্তু কলিকাতায়

কোনও ঢপওয়ালীকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে । ঢপ সঙ্গীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্বে কখনও শুনা যায় নাই । গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাইগঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, ঢপ আনিতে হইবে । উহারা কোন্ ঢপওয়ালীকে বায়না দিয়াছে, সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে । তাহার নামটি সঠিক জানিতে পারিলে, বর্ধমানে অথবা কলকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে । সেই ঢপওয়ালী অপেক্ষা কোন্ ঢপওয়ালী সমাধিক খ্যাতিসম্পন্না এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালীকে গাওনা করিবার বায়না দিতে হইবে, - ইহাতে যত টাকা লাগে লাগুক্ । কারণ গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের এক বাক্যে ইহাই মত যে, তিনপুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোন বিষয়ই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই, এবং আজিও হটিবে না ।

আগামী বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল । তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে মোড়লের পো অমন করে বসে পড়লে কেন ? কি হয়েছে ?'

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হতে আর বাকী আছে ? হায় হায় হায় - কার্তিক মাসে যখন আমার জ্বর বিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন ? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিল হারে বিধাতা, তোর পোড়া কপাল ।'

শ্যামাপদ ও কেনারাম ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন । দত্তজা বলিলেন, 'কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? সব কথা খুলে বল । এখন আসছ কোথা থেকে ?'

দীর্ঘ-শ্বাস-জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, নন্দীপুর থেকে । হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল । হা-রে কপাল ।' - বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল । দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন কেন ? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে ? বলছি । বলবার জন্যই এসেছি । এই রোদ্দুরে মশাই এক ক্রোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি । গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, এক ঘটি জল -----।'

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটি আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল। কিঞ্চিৎ পানও করিল। তার পর মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল। হীরু দত্ত বলিলেন, 'এবার বল কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু।' রামচরণ বলিল, 'কি হয়েছে ? যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় শহরে যা হয়না তাই নন্দীপুরে হয়েছে। এ সব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই হয়েছে তারা হুস্কুল বসিয়েছে।'

তিন জনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি আবার ? হুস্কুল কি ?' রামচরণ বলিলেন, 'আরে ছাই আমিই কি জানতাম হুস্কুল কার নাম ? আজ না শুনলাম। ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।'

দত্তজা বলিলেন, 'ও - ইস্কুল খুলেছে বুঝি ?' 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ - তাই খুলেছে। একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরুমশায়কে নাকি ম্যাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখলাম, ম্যাষ্টার বসে - দশ বারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছেন।' হীরু দত্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাষ্টার কোথা থেকে এসেছে তা কিছু শুনলে?' 'সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্ধমান থেকে এসেছে। বামুনের ছেলে - হারাণ চক্রবর্ত্তী। পনেরো টাকা মাইনে, বাসা খোরাক। সব খবর নিয়ে এসেছি।'

বাহিরে এই সময় একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল পিল করিয়া লোক সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব পরাভব সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, 'এ কি সর্বনাশ হল। নন্দীপুরের হাতে এই অপমান। আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে ?' হীরু দত্ত তখন বারান্দার রোয়াকে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন - 'ভাই সকল। তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পর গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে ? কখনই না এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও স্কুল খুলব। ওরা বা কী ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভালো ইস্কুল খুলব। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া দাওয়া করে,

আমি বেরুচ্ছি । কলকাতায় যাবার রেল খুলেছে, আর ত কোন ভাবনা নেই । আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসবো । আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো - বসাবো - বসাবো - তিন সত্যি করলাম । এখন যাও, তোমরা বাড়ী যাও । স্নানাহার করগে ।'

'জয় গোঁসাইগঞ্জের জয় । জয় হীরু দত্তর জয় ।' সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল ।

(২)

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র । বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বকার কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী । ইংরাজী বলিতে, কহিতে, লিখিতে, পড়িতে তিনি নাকি ভারি ওস্তাদ । ইংরেজীটা তাঁর এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজী কথা মিশাইয়া ফেলেন - অজ্ঞলোকের সুবিধার্থে আবার তাহা বাঙ্গলা করিয়া বুঝাইয়াও দেন । বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে একদিন কলকাতার গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয় । সাহেব তাহার ইংরাজী শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন । লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া ডেপুটি কালেকটারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন । কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই স্তাব তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং । মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চালচলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল ।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে, পরদিনই ইস্কুল খুলিল । পনেরো ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন । কলিকাতা হইতে দত্তজার ব্যয়ে তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং বুক পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন; ছাত্রগণের উৎসাহ বর্ধনার্থে সেগুলি তাহাদিগকে বিনা মূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল ।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে ঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত । গোঁসাইগঞ্জ বলিত, 'বর্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি আর পড়াবেই বা কি ?' নন্দীপুর বলিত, 'হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্ধমানে বাড়ী, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন, ওঁরা যখন পড়তেন তখন কি বর্ধমানে ইংরেজি ইস্কুল ছিল ? কলকাতায় গিয়ে ইংরেজি পড়তে হত ।'

যথাসময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল । উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপ সঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল । এই উপলক্ষ্যে উভয় মাষ্টারের দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্বাবধি পরিচিত । পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল । নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন, 'ঐ বেটা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এতদিন জানতাম না । ওটা ত মহা মূর্খ । ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক ক্লাসে পড়তাম কি না । আমরা যখন সেকেণ্ড বুক পড়ি, সেই সময়েই ও স্কুল ছেড়ে দেয়, তারপর আর ত ও ইংরেজি পড়েনি । বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে সাতটাকা ছিল । গেল বছরও ত কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় । তখনও ত ঐ চাকরি করছে।'

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি শুনছি ?' ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন । বলিলেন, 'অ্যাঁ । এই কথা বলেছে? ও সব তো বিলকুল ফঁলসো - মিথ্যে কথা । সেই মাষ্টারের কাছে গিয়ে ভজিয়ে দেবে না? তিনি কি আর বেঁচে আছেন ? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেবেন স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট - নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, বেশ মনে আছে । আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে । একেবারে সন্ ইকোয়াল - পুত্রতুল্য । তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ইগনোরেণ্ট - অজ্ঞান ।'

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল এই হইল । উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল । অবশেষে স্থির হইল যে কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক । উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে তাহারই নীম্নে

বিচার সভা বসিবে । কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । সুতরাং যাহাতে জয় পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছু মাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচারপ্রণালী স্থির করা আবশ্যক । উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মাষ্টারেরা পরারকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তাহলে উভয়ে তুলামূল্য । একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে তিনিই জয়পত্র পাইবে । বিচারের দিন স্থির হইল - আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা, স্থান - উপরোক্ত বটবৃক্ষ তল, সময় সূর্যাস্ত ।

(৩)

ধার্যদিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন । তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাগারা বাদ্যকরণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটি বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে - ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে । পথে যাইতে যাইতে ব্রজমাষ্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন - 'কি হে মাষ্টার ! মুখ রাখতে পারবে তো ? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারান মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে না বলতে পারে ।' ব্রজবাবু বলিলেন, 'আপনারা ভাবছেন কেন ? দেখুন না কি করি, এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে তা শুনেই হারান মাষ্টারের আক্কেল গুম হয়ে যাবে - মানে বলা তো দূরের কথা ।' দত্তজা বলিলেন, 'দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব ।' কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ।

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল । শপ্, মাদুর, শতরঞ্জি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্বেই আনিয়া নিজ গ্রামের সীমারেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে । দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল । তাহাদের সঙ্গেও শপ, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক-ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে । ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার

নিকট শপ, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল । উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি ।

এখন প্রশ্ন উঠিল কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন ? উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার দাবী করিল । কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে । অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া উর্দ্ধে ছুড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন ।

'আমার ছড়ি লউন - আমার ছড়ি লউন' বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন । ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল । সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে ।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল । গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চুন হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচারে ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল ।

নন্দীপুরের হারাণ মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল । কিন্তু প্রাণপন চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না ।

হারাণ মাষ্টার তখন বলিনেন, 'আচ্ছা বল দেখি, এর মানে কি - HORNS OF DILEMMA.'

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কূটপ্রশের অর্থ অবগত ছিলেন, তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্য বদনে বললেন, 'এর মানে - উভয় সঙ্কট - কেমন হল কি না ?' 'পেরেছে - পেরেছে - আমাদের মাষ্টার পেরেছে' - বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল । দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন । এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, - 'শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করিতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব । এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দুজন যা ইংরাজী নবীশ আছি । একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা

করে তোমায় ঠকিয়ে দেবো, সেটা আমার মনঃপুত নয় । এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জের লোক রাগ করতে পারেন - কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজি-নবীশ হয়ে আর একজন ইংরেজি নবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে । আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি - বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায় । আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি - তুমি জান নিশ্চয়ই - আচ্ছা, এর মানে বল - I DON'T KNOW.' হারাণ মাষ্টার বলিল, - 'আমি জানি না ।'

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল । সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল, 'হো হো, জানে না - নন্দীপুর জানে না - । হেরে গেল, হেরে গেল ।'

হারাণ মাষ্টার মহা বিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক-ঢোল, কাড়া, নাগারা ও রামশিঙা সমবেতভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না ।

গোঁসাইগঞ্জনিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল ।

পরদিন শুনা গেল হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন । তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল । গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর, ননী, ছানা, ভুঞ্জন করিতে লাগিলেন ।

অনুশীলনী :

১। অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে নন্দীপুর সম্বন্ধে কি গুজব শুনা যাচ্ছিল এবং সেই সম্পর্কে গোঁসাইগঞ্জের লোকদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল লিখুন ?

২। 'হায়, হায় ! শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল । হা-রে কপাল' এই কথা কে এবং কেন বলেছিল ?

৩। ব্রজগোপাল মিত্র সম্পর্কে যা জানেন লিখুন ।

৪। এক গ্রামের লোকের সাথে অন্য গ্রামের লোকের দেখা হলে তাদের মধ্যে কি আলোচনা হত এবং তার পরিণাম কি - আলোচনা করুন ।

৫। উভয় মাষ্টারের উপযুক্ততার কি ভাবে পরীক্ষা হল তার বর্ণনা দিন ।

৬। বাক্য রচনা করুন :

কিঞ্চিদধিক, বর্ধিষ্ণু, দণ্ডায়মান, অদৃশ্য, মাতব্বর, বারোয়ারী, পার্শ্ববর্তী, ধুমধাম, অধিকন্তু, বায়না, খ্যাতিসম্পন্না, গ্রামস্থ, মোড়ল, কিয়ৎক্ষণ, পরাভব

৭। অর্থ লিখুন :

রোয়াক, প্রস্থান, খর্বাকার, কৃশকায়, প্রত্যাখ্যান, পূজান্তে, পরস্পরের, অপবাদ প্রয়োগ, সন্দিহান, নীম্নে সম্মতিক্রমে, শোভাযাত্রা, আক্কেল গুড়ুম, উপনীত, ছড়ি, উর্দ্ধে

৮। সমার্থক শব্দ লিখুন :

উল্লাসে, প্রতীক্ষা, সৌভাগ্যক্রমে, অবগত, দলপতি, ইংরেজিনবীশ, বিপন্নভাবে, শ্রুতিগোচর, স্কন্ধে

পাঠ - ৩

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর

প্রস্তাবনা :

এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত রচনা । এখানে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । বিদ্যাসাগরের বিরাট কর্মযজ্ঞের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা । তবুও লেখক শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের একটা চিত্র সহজ ও সাবলীল ভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসুক পাঠকের তৃষ্ণায় পানীয় দান করেছেন ।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ১৯১৯ সালে পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার বাথুয়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম. এ পাশ করার পর তিনি পি.এইচ.ডি এবং পরে ডি.লিট উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন । 'কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও বাংলা গীতি কবিতার ধারা' এবং 'সাধক কবি দ্বারিকা দাসের মনসা মঙ্গল' প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা । পরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণামূলক বৃত্তি নিয়ে 'মধ্যযুগের ওড়িয়া কবিদের বাংলা সাহিত্যে অবদান' নিয়ে গবেষণা করেছেন ।

অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বাংলাদেশের অর্থনীতি, ধর্মনীতি এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমস্যাজর্জর পঙ্গু সমাজের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় । এই ভাবজড়তার যুগে অবিস্মরণীয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার সামাজিক জীবনে দুঃখের পেয়ালা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল । রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী প্রত্যক্ষ করলো সুদীর্ঘ কালরাত্রির

শেষে প্রভাতের অরুণোদয় । রামমোহনের উত্তরসুরীরূপে এক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব । রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বাস্তবে পরিণত করতে আমৃত্যু কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন । কি করে শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে এক রেঁনেসা এসেছিল এই প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ।

শব্দ সম্ভার :

পঙ্গু	অকেজো
মন্বন্তর	দুর্ভিক্ষ
আস্বাদন	স্বাদগ্রহণ
চঞ্চল	অস্থির
সমন্বয়	মিলন
সোপান	সিঁড়ি
দৃষ্টিভঙ্গী	দেখার ধরণ
সামীপ্য	কাছে
সর্বজনগ্রাহ্য	সকলের গ্রহণীয়
ফলশ্রুতি	পূণ্য করলেই যে ফল হয় তা শোনা
সমস্যা সঙ্কুল	সংকট পূর্ণ
বৈপ্লবিক	বিপ্লব সম্পর্কিত
যুক্তিবাদী	যুক্তি অনুযায়ী
অতুলনীয়	যার তুলনা হয় না
প্রত্যাখ্যাত	ফিরিয়ে দেওয়া

মূল পাঠ :

কোনো দেশে কোনো যুগে সামাজিক পরিবর্তন আকস্মিক ভাবে হয়নি । প্রকৃতপক্ষে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের বীজ নিহিত থাকে, আর কর্মযোগী প্রতিভাবান পুরুষ সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীকে কাজে পরিণত করে সামাজিক পরিবর্তনটিকে

সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন । সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটিও স্মরণীয় যে শিক্ষা ব্যবস্থাই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করে । তাই যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত বেশী উন্নত সে দেশের পরিবর্তন ততই সার্থক । পশ্চিমী দেশগুলির দ্রুতপরিবর্তন উন্নত শিক্ষা বিস্তারের ফলশ্রুতি।

অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ছিল সমস্যাসঙ্কুল । রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই সমস্যাজর্জর পঙ্গু সমাজ মনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছে । একটা দৃঢ় ধারণা বোধহয় জনমানসের বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে তৎকালীন সেই সব সমস্যার সমাধান কোন দিনই সম্ভব নয় । একটা স্থাবর বিষন্নতায় বাঙালীর চিন্তাশক্তি সেদিন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল । এই ভাবজড়তার যুগে প্রকৃতিও তাকে আঘাত করতে দ্বিধা করেনি । ১৭৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) খ্রীষ্টাব্দের অবিস্মরণীয় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা ও বাঙ্গালীর দুঃখের পেয়ালা পরিপূর্ণ করেই দেখা দিয়েছিল ।

তবু এক সময় সুদীর্ঘ শীতরাত্রির শেষে বাঙালী প্রত্যক্ষ করল প্রভাতের অরুণোদয়। বাঙালীর ভাবজগতে নবজন্মের সূচনা হল রামমোহনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে । রামমোহন যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলেন, অনিবার্য ভাবেই তার ফল বাঙালী মনের স্থাবর বিষণ্নতা দূরীভূত হোল, বিশ্লেষণী আর যুক্তিবাদী চিন্তাধারার অনুসরণস্পৃহা বাঙালীকে নতুন জীবনরসের আস্বাদনে চঞ্চল করে তুলল । কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয়, তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সমাজের সর্বস্তরকে অবলম্বন করে কর্মযজ্ঞের রূপ ধারণ করতে পারেনি । পারেনি হয়ত এই কারণেই যে, মানসিকতার বিচারে তিনি ছিলেন একান্তই অভিজাত-ধর্মী ।

রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উত্তর সাধনের রূপ পরিগ্রহ করেছে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মে । সেই রূপ এত বিরাট যে কোনক্রমেই তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয় । সমাজ দেহের প্রতিটি রুগ্ন অঙ্গ সেবক বিদ্যাসাগরের করুণাস্পর্শে ব্যাধিমুক্ত হয়েছিল সে যুগে। তার ব্যাপকতা আর গভীরতা স্থুল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিছু পরিমাণে, সূক্ষ্ম অনুভূতিগ্রাহ্য বহুল পরিমাণে । সমকালীন পণ্ডিত-সমাজ এই যুগপুরুষটির কর্মধারার মূল্যায়ন করতে গিয়েছিলেন তাঁদের পাণ্ডিত্যের মানদণ্ডে, আর মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন, - এ সত্য ইতিহাসের বুকে সঞ্চিত হয়ে আছে ।

উনিশ শতকের যুগ্ম যুগপুরুষ রামমোহন আর বিদ্যাসাগর । অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এ সমস্ত কিছুর বিচারে এঁরা অতুলনীয় । রামমোহন তাঁর সংস্কারধর্মী চিন্তাধারা নিয়ে সাধারণভাবে জনমানসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পারেন নি যে আভিজাত্যের ফলে, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তারই অভাব তাঁকে অনায়াসে জনসাধারণের সামীপ্য দিয়েছে । রাজা রামমোহনের সমাজসেবামূলক উত্তরাধিকার আর দরিদ্রের রাজতিলক এ দুয়ের অধিকারী হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর । তাই সাধারণ মানুষের বেদনা তাঁর হৃদয়কে করুণায় প্লাবিত করেছে চিরকাল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই । এই করুণাময়তা কিন্তু দুর্বলতা নয়, বরং শক্তিমতারই প্রেমময় স্বরূপ ।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার চিন্তা বৈপ্লবিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে সর্বপ্রথমে শিক্ষার ক্ষেত্রেই । বাধার কাছ নতি স্বীকার বা আপোষমূলক মনোবৃত্তি বিদ্যাসাগরের জীবনে কোন দিনই দেখা যায়নি । সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রথম শিক্ষা-সংস্কারমূলক প্রস্তাব সম্পাদকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন, এ খবর সকলেই জানেন । সংস্কৃত কলেজে পুনরায় অধ্যক্ষ হিসেবে উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন ।

সংস্কৃত কলেজে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে ছিল অনুদারতা । ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তান ছাড়া, কারো প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে । বিদ্যাসাগর শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু জাতিভেদই দূর করলেন না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে সুস্থবুদ্ধি ও উদার চিন্তাশক্তির উদ্বোধনে সহায়তা করলেন । বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন যে, সমন্বয়ধর্মী শিক্ষার মধ্যেই সামাজিক অগ্রগতির বীজ নিহিত । নবজাগরণের যে মূলমন্ত্র পাশ্চাত্যে উদ্গীত হয়েছে তাকে ভারতীয় চিন্তার পটভূমিতে গ্রহণ করতে আর সেই সঙ্গে সর্বসংস্কারমুক্ত চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতিই সক্ষম হবে । এছাড়া তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে সর্বপ্রকার শিক্ষাসংস্কার, দূরদর্শিতা আর মানুষের কল্যাণ চিন্তার পটভূমিতেই সাধিত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু এই সংস্কারক্রিয়া যদি পর্যায়ক্রমিক না হয়ে একই কালে আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিযুক্ত সর্বপ্রকার কর্মীদের মনের ওপরও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। ডঃ ব্যালেন্টাইন্ প্রস্তাবিত সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর শিক্ষাপরিষদে যে দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রেরণ করেন, সেটি এই প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব

অনুধাবনে যথেষ্ট সহায়তা করে । এই প্রতিবেদনে তিনি সাংখ্য আর বেদান্তকে *'ভ্রান্ত দর্শন'* বলে স্বীকার করে নিয়েও, সেগুলির অধ্যয়ন বন্ধ করার পরামর্শ দেননি । এগুলির প্রতি হিন্দুদের সহজাত শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করেই বিদ্যাসাগর যদিও এগুলির অধ্যাপনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী থেকেছেন, বার্কলের inquiry একই প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের পোষকতা করে বলে তার অন্তর্ভুক্তির কিন্তু বিরোধিতা করেছেন ।

সামাজিক কুসংস্কার দূর করার প্রথম ও প্রধান সোপান যে জনশিক্ষার বিস্তার, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কোন সন্দেহ ছিল না । শিক্ষাবিস্তার বলতে তিনি শুধু বিদ্যালয় স্থাপন বুঝতেন না । এই প্রসঙ্গে তিনি এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, 'জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার - ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন । আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, সেই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য ভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল ।' অসঙ্কোচে বলা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন স্বচ্ছচিন্তার পরিচয় ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নি । শুধু প্রতিবেদনের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর চিন্তাকে যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, এ তথ্যটিও আমাদের জানা দরকার । তিনি বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় আর শিক্ষণ-শিক্ষা দেবার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন, আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন । তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে *বর্ণ-পরিচয়* থেকে *বাংলাসাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল* এমন *কি অভিধানও* স্থান পেয়েছিল । প্রধানত বিদ্যাসাগরের প্রেরণায়ই স্যার হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা, বিহার আর উড়িষ্যায় ১০১ টি পাঠশালা স্থাপন করে আঞ্চলক ভাষা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেন । এগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল বিদ্যাসাগর আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পাদক মার্শেলের ওপর ।

বাংলাদেশের প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে শিক্ষাসংস্কারমূলক যে প্রস্তাব বড়লাটের অনুমোদনের জন্য পাঠান তার প্রস্তুতিতেও যে বিদ্যাসাগরের অবদান যথেষ্ট ছিল, এ তথ্য ঐ প্রস্তাবের মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে । এই হ্যালিডের ধারণা ছিল, 'মাথার উপর কোন ইউরোপীয় না থাকিলে, দেশীয় তত্ত্বাবধায়কদের বেশী বিশ্বাস করিতে পারা যায় না ।' কিন্তু তিনিই আবার লিখেছেন, 'কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসাধারণ লোক । এই পরীক্ষার ভার

তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব ।' বিদ্যাসাগরকে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা কী পরিমাণে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কী গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাঁদের ছিল, উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেই তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় । প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে কলিকাতা, মাদ্রাজ আর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে সংগঠিত 'পরামর্শ সংস্থা'র তিনি অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, আর স্থাপিত হওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 'ফেলো' হিসেবেও তিনি মনোনয়ন লাভ করেছিলেন ।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা ছাড়া বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ বাংলায় বিদ্যালয়সমূহের সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে অনেক বেশী কাজ করতে হোত । এই সময় তিনি অক্ষয় কুমার দত্তকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে নর্মাল স্কুলের কাজ শুরু করেন । আর নদীয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় পাঁচটি করে মোট কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন । এই সময় তিনি পাইকপাড়ার রাজা আর ঘাটালের কয়েকজন বদান্য ব্যক্তির সহায়তায় দুটি সংস্কৃত-ইংরেজী প্রবেশিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ।

বিধবা বিবাহ প্রচলনে আর বহু বিবাহ প্রথার বিলোপ সাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান সর্বস্বীকৃত । এই সব সমাজ সংস্কারমূলক অভিযান চালাতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে স্ত্রী শিক্ষার সম্প্রসারণ ছাড়া এই সব সামাজিক সংস্কার সম্ভব নয় । শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন যুক্ত হলে, তবেই তার সাফল্য অবধারিত ।

প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে । এর পর প্রায় সাত মাসের মধ্যে তিনি হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এগুলিতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০ আর এগুলির জন্য মাসিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৮৪৫ টাকা । বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক সংগ্রহ ও তাঁদের শিক্ষণ-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ ও সেই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক রচনা, অধ্যাপনা এবং সর্বোপরি শিক্ষাদর্শ নির্ধারণ, - শিক্ষাব্যবস্থার এই সর্বাত্মক ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর আত্মনিয়োগ করেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে এইখানেই বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য এবং এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁর কোনো পূর্বসুরীর সাক্ষাৎ পাইনা ; পাই একজন সার্থক অনুগামীকে - যিনি হলেন **রবীন্দ্রনাথ** ।

অনুশীলনী :

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

ক) সামাজিক পরিবর্তন কখন কি ভাবে হয় ?

খ) অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল ?

গ) বাঙালীর দুঃখের পেয়ালা পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দিল কখন ?

ঘ) বাঙালীর ভাব জগতে নবজন্মের সূচনা করলেন কে ?

ঙ) বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের চিন্তা কোথায় কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে?

চ) বিশেষকরে কোন ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর উদার চিত্তের পরিচয় দেন ?

ছ) কত সালে এবং কোথায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ?

২। সামাজিক কুসংস্কার দূর করার প্রতিবেদনে বিদ্যাসাগর কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ?

৩। আলোচনা করুন :

'স্ত্রী শিক্ষার সম্প্রসারণ ছাড়া এই সব সামাজিক সংস্কার সম্ভব নয় ।'

৪। বাক্য রচনা করুন :

ক) বৈপ্লবিক

খ) যুগপুরুষ

গ) অবিস্মরণীয়

ঘ) তত্ত্বাবধান

ঙ) অসঙ্কোচ ।

পাঠ - ৪

বল বল বল সবে

প্রস্তাবনা :

এটি একটি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা ও গান । এই গানটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জাতীয় জাগরণের মন্ত্র রূপে পরিগণিত হয়েছিল । এই কবিতার রচয়িতা অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়েছিল ফরিদপুরে ১৮৭১ সালে এবং মৃত্যু হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। তিনি ছিলেন সঙ্গীত রসিক ও সুকণ্ঠের অধিকারী । তিনি পেশায় একজন সুদক্ষ আইনজীবী হলেও বাংলাভাষীদের কাছে অতুল প্রসাদের পরিচয় একজন স্বদেশপ্রেমী ও সুরকার হিসেবে। তাঁর গানের অন্যতম সম্পদ 'সুরের বৈচিত্র্য' । তিনিই প্রথম বাংলাগানে উর্দু গজলের ঢঙে সুর সংযোজন করেন । ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁর রচিত *হওধরমেতেধীর, বল বল বল সবে, উঠ গো ভারতলক্ষ্মী* ইত্যাদি গানের গুরুত্ব অপরিসীম ।

তাঁর গানের সংকলন গ্রন্থের নাম গীতিকুঞ্জ (১৯৩১) । এই কবিতায় কবি পরাধীন ভারতের জনগনকে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার জন্য জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন । প্রাচীন ভারতের মনিষীরা ভারতবাসীকে যেভাবে একতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, সেইভাবে পুনরায় ভারতমাতার চরণে এসে মাতৃ মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভারতের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার শপথ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ।

শব্দ সম্ভার :

রব	ধ্বনি
শ্রেষ্ঠ	সবচেয়ে বড়
উদিবে	উঠবে
পুরব	পূর্ব
ঘিরি	বেষ্টন করে
বিদুষী	বিদ্বান মহিলা
সন্ততি	সন্তান
নন্দন	ছেলে
সহিছে	সহ্য করছে
মহান	মহত্ব ভাব, বড়
দিনমণি	সূর্য
পুরাতন	পুরোনো
গিরিরাজ	হিমালয়
লহরী	ঢেউ
প্রসূতি	জন্মদাত্রী
হীনতা	নীচভাব
দ্বেষ	হিংসা
জাগিবে	জেগে উঠবে
গিরি	পাহাড়

মূল পাঠ :

বল, বল, বল সবে, শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ।
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে ।
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী

ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃতবাহিনী
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব কাহিনী ।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী,
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধুতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র প্রসূতি, আমরা তাঁদেরই সন্ততি ।
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত নন্দনে ।
ভুলি ধর্ম দ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশকোটি দেহ হবে এক প্রাণ, এক জাতি প্রেমবন্ধনে ।
আমাদের এ দেশ নাই রবে পিছে,
ঋষি - রাজকুল জন্মেনি মিছে,
দু দিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে ।
আসিবে শিষ ধন বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য, আসিবে আবার আসিবে ।
এস হে কৃষক কুটির নিবাসী,
এস অনার্য গিরি বনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী, - মিল হে মায়ের চরণে ।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, - মিল হে মায়ের চরণে ।

অনুশীলনী :

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

ক) গিরিরাজ কে ? তাকে প্রহরী বলা হয়েছে কেন ?
খ) '*পুরাতন এ পূরবে*' বলতে কবি এখানে কি বোঝাতে চাইছেন ।

পাঠ - ৫

পিতৃভক্তি

প্রস্তাবনা :

'পিতৃভক্তি' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত ঐতিহাসিক নাটক *'শাহজাহান'* -এর অংশ বিশেষ । কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান কার্তিক চন্দ্র রায়ের ছেলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩ সালে ও মৃত্যু ১৯১৩ সালে । কবি ও গীতিকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সুপরিচিত হলেও নাট্যকার হিসেবে তাঁর অবদানের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এখানে আওরঙ্গজেব কিভাবে তাঁর বৃদ্ধ পিতা ভারতের সম্রাট শাহাজাহানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ছল, বল ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে তাঁর ভায়েদের হত্যা করে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছিলেন আর অপরপক্ষে সেই আওরঙ্গজেবেরই পুত্র মহম্মদ তাঁর পিতৃবাক্য পালনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনকেও অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে পিতৃভক্তির চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তারই একটি জীবন্ত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে ।

শব্দ সম্ভার :

সাগ্রহে	গভীর আগ্রহে
প্রগাঢ়	গভীর
নিঃশঙ্কচিত্তে	ভয়হীন হৃদয়ে

হিতৈষী	বন্ধু
অশ্বারুঢ়	যে ঘোড়ায় চড়ে আছে
আজ্ঞাবহ	যে আদেশ পালন করে
অধীশ্বর	রাজা
ভুজঙ্গ	সাপ
খধূপ	আতসবাজি
শঠ	তারক
পৌ	ছেলের ছেলে
কেশরী	সিংহ
কশাঘাত	বেত দিয়ে মারা
পঙ্গু	অকেজো
উদ্ধত	উগ্র স্বভাব
কপট	খল
অভিায়	ইচ্ছা
সেঁধিয়ে	ঢুকে
নিস্প্রভ	ক্ষীণ
স্থবির	বুড়ো
প্রলোভন	লোভ
আর্তনাদ	চীৎকার
নিবৃত্তি	আকর্ষণ বলে চলে যাওয়া
ধূর্ত	চালাক
রোষ	রাগ
কৃতঘ্ন	যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না
ক্ষিপ্ত	ক্ষেপে যাওয়া
স্থান	আগ্রার প্রাসাদ
কাল	অপরাহ্ন

মূল পাঠ :

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান : জাহানারা ! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা করছি । সে আমার উদ্ধত বীর পুত্র, আমার লজ্জা - আমার গৌরব ।

জাহানারা : গৌরব পিতা । এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে । সেদিন যখন আমি তার শিবিরে গেলাম, সে আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে, বললে যে সে মহাপাপ করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দু এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌লে, আর বল্‌লে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে । আমি সরলভাবে তার সেই কথা বিশ্বাস করে তাকে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম । সে তাদের অমনি বন্দী করেছে । আমি দারাকে পত্র লিখেছিলাম । পথে সে পত্র সে হস্তগত করেছে । - এত কপট । এত ধূর্ত ?

সাজাহান : না জাহানারা, তা সে করতে পারে না । না, না, না । আমি এ কথা বিশ্বাস করব না ।

জাহানারা : আসুক সে একবার এই দূর্গে । আমি কৌশলে তাকে বন্দী করব । ঐ কক্ষে একশত সশস্ত্র সৈনিক গুপ্তভাবে রেখেছি । তাকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী করব ।

সাজাহান : সে কি জাহানারা, সে আমার পুত্র, তোমার ভাই ! জাহানারা, কাজ নাই। আসুক সে । আমি তাকে স্নেহে বশ করব । তাতেও যদি সে বশ না হয় - তাহলে তার কাছে, পিতা আমি - তার সম্মুখে নতজানু হয়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো । বলবো, আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসার অবকাশ দাও ।

জাহানারা : সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করব, বাবা ।

সাজাহান : পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই ।
(মহম্মদের প্রবেশ)

সাজাহান : এই যে মহম্মদ ! তোমার পিতা কই ?

মহম্মদ : তা ত জানি না ঠাকুরদা ।

সাজাহান : সে কি ! সে এখানে আসবার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে, শুনলাম ।

মহম্মদ : কে বললে ? তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়তে গেছেন। আমি ত যতদূর জানি তাঁর এখানে আসবার কোন অভিপ্রায় নেই ।

জাহানারা : তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ ?

মহম্মদ : এ প্রাসাদ-দূর্গ অধিকার করতে ।

সাজাহান : সে কি ? না, তুমি পরিহাস করছ মহম্মদ ।

মহম্মদ : না ঠাকুরদা, এ সত্য কথা ।

জাহানারা : বটে । তবে আমি তোমাকেই বন্দী করব ।
(বাঁশী বাজাইলেন - সশস্ত্র পঞ্চপ্রহরীর প্রবেশ)

জাহানারা : অস্ত্র দাও মহম্মদ ।

মহম্মদ : সে কি !

জাহানারা : তুমি আমার বন্দী । সৈনিকগণ ! অস্ত্র কেড়ে নাও ।

মহম্মদ : তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হবে ।
(বাঁশী বাজাইলেন - দশজন দেহ রক্ষীর প্রবেশ)

মহম্মদ : আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো ।

জাহানারা : সহস্র সৈনিক ! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে দিল ?

সাজাহান : আমি দিয়েছি, জাহানারা । সব দোষ আমার । আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম । ওঃ আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি, মহম্মদ।

মহম্মদ : ঠাকুরদা ।

সাজাহান : আমি কি তবে এখন বুঝবো, যে আমি তোমার হাতে বন্দী ?

মহম্মদ : বন্দী নন ঠাকুরদা । তবে, আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই ।

সাজাহান : আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা । একি একটা সত্য ঘটনা ? না এ সব স্বপ্ন ? আমি কে ? আমি সম্রাট সাজাহান ? তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে

তরবারি খুলে ? - একি ! একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উঠে গেল ! একদিন যার রোষ কষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত - তার - তার পুত্রের হাতে - আমি বন্দী ! জাহানারা !

কৈ ! এই যে ! এ কি কন্যা ! তোর ঠোঁট নড়ছে, কথা বার হচ্ছে না, গণ্ডদুটি ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গিয়েছে ! - কি হয়েছে মা ?

জাহানারা : না, বাবা ; কিন্তু জানতে পারলে কেমন করে ? আমি শুধু ভাবছি ।

সাজাহান : মহম্মদ ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার - এখানে এই রকম বসে নিঃসহায়ভাবে সহ্য করব ? ভেবেছো এই কেশরী স্থবির বলে তোমরা তাকে পদাঘাত করে যাবে ? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান ! এই, কে আছো ? নিয়ে এসো আমার বর্ম আর তরবারি । - কৈ, কেউ নেই ?

মহম্মদ : ঠাকুরদা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বার করে দেওয়া হয়েছে ।

সাজাহান : কে দিয়েছে ?

মহম্মদ : আমি ।

সাজাহান : কার আজ্ঞায় ?

মহম্মদ : পিতার আজ্ঞায় । এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীর কাজ করবে ।

সাজাহান : মহম্মদ ! বিশ্বাসঘাতক !

মহম্মদ : আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র ।

সাজাহান : ঔরংজীব ! - না, আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায় ! তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে এক বার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারতাম, তাহলে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়তো। একবার খোলা পাই না ? একবার খোলা পাই না ? - মহম্মদ । আমায় একবার মুক্ত করে দাও । একবার । একবার ।

মহম্মদ : ঠাকুরদা, আমায় দোষ দেবেন না । আমি পিতার আজ্ঞাবহ ।

সাজাহান : আর আমি, - তোমার পিতার পিতা না ? সে যদি তার পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয় - তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে ? মহম্মদ, এসো। দুর্গদ্বার খুলে দাও ।

মহম্মদ : মার্জ্জনা করবেন, ঠাকুরদা । আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না ।

সাজাহান : দেবে না ? দেবে না ? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ - রুগ্ন, জীর্ণ, স্থবির। আর কিছু চাই না । শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই । আবার ফিরে আসবো, শপথ করছি । দেবে না ? দেবে না ?

মহম্মদ : ক্ষমা করবেন ঠাকুরদা । আমি তা পারবো না ।

[গমনোদ্যত]

সাজাহান : দাঁড়াও মহম্মদ । [কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দৌড়িয়া গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরান লইয়া] দেখ মহম্মদ এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ! এই কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করছি যে, বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো । কারো সাধ্য নাই যে, প্রতিবাদ করে । আমি আজ বৃদ্ধ, শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে, কিন্তু সম্রাট সাজাহান - এ ভারতবর্ষে এতদিন ধরে এমন শাসন করে এসেছে যে, যদি সে একবার তার সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হলে শুধু তাদের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে । মহম্মদ ! আমায় মুক্ত করে দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে। আমি শপথ করছি, মহম্মদ । শপথ করছি। - আমি শুধু এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখাবো । মহম্মদ !

মহম্মদ : ঠাকুরদা । মার্জনা করবেন ।

সাজাহান : দেখ । এ ছেলেখেলা নয় । আমি স্বয়ং সম্রাট সাজাহান - কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করছি - দেখ একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য - বেছে নাও এই মুহূর্তে ।

মহম্মদ : ঠাকুরদা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না ।

সাজাহান : একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না ?

মহম্মদ : পৃথিবীর জন্যও না ।

সাজাহান : দেখ মহম্মদ । বিবেচনা করে দেখ । ভালো করে বিবেচনা কর - ভারতের অধীশ্বর ....

মহম্মদ : আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা শুনবো না । প্রলোভন বড়ই অধিক । হৃদয় বড়ই দুর্বল, ঠাকুরদা । মার্জনা করবেন ।

[প্রস্থান]

সাজাহান : চলে গেল ! চলে গেল ! জাহানারা ! কথা কচ্ছিস না যে !

জাহানারা : ঔরংজীব তোমার এই পুত্র । যে তার পিতার আজ্ঞা পালন করতে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে - আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তাকে ছলে বন্দী করেছো ।

সাজাহান : সত্য বলেছো কন্যা । - পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না। তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না । তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর । তারা সব শিশু শয়তান । তাদের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো । তাদের সকালে বিকালে জোরে কশাঘাত কোরো । তাদের সারা জীবনটা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো । তা হলে বোধ হয় তারা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে । তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে, তো বুক ভেঙে ফেলো, চোখে জল আসে তো চোখ উপড়ে তুলে ফেলো, আর্তনাদ করতে ইচ্ছে হয় তো নিজের টুঁটি ধরো । ওঃ ....

জাহানারা : বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পঙ্গুর মত বসে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না, পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে ডাকলে কিছু হবে না । উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন, হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন । নিবৃত্তির মত কঠিন হউন, শয়তানের মত ক্রুর হউন । তবে তার সঙ্গে পারবেন ।

সাজাহান : উত্তম । তবে তাই হোক । আয় মা, তুইও আমার সহায় হ । আমি অগ্নির মত জ্বলে উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয় । আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাকে এসে গ্রাস কর । আমি অসি নিয়ে আসি, তুই মড়ক নিয়ে আয় । আয় তো, একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাই, - তারপর কোথায় যাই ? কিছুই যায় আসে না । খধূপের মত এক বিরাট জ্বালায় উর্দ্ধে উঠে - বীরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি ।

অনুশীলনী :

১। এই নাট্যাংশের 'পিতৃভক্তি' নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন ।

২। এই নাট্যাংশের কোন চরিত্রটি আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে ? কেন ভালো লাগে?

৩। 'সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত বীর পুত্র, আমার লজ্জা, আমার গৌরব ।' - এ কার উক্তি ? এখানে কোন পুত্রের কথা বলা হয়েছে ? সে কোন বক্তার 'লজ্জা' ও 'গৌরবের' কারণ ?

৪। 'আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না' - এটা কার উক্তি ? কেন তিনি এ কথা বলেছেন ? এই উক্তি থেকে তার চরিত্রের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

৫। 'তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর' - কোন অবস্থায় কে এই উক্তি করেছেন ? কেন করেছেন ? এই উক্তি থেকে তাঁর মনের কোন ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় ?

৬। ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) চক্ষু দিয়ে একটা ———— কি হয়েছে মা ?

খ) এ বাতুলের ———— এই মুহূর্তে ।

গ) প্রলোভন বড়ই ———— দুর্বল ।

ঘ) নিবৃত্তির মত ———— ক্রুর হউন ।

ঙ) খধূপের মত এক———— শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি ।

৭। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ।

ক) তিনি তো ঘোড়ায় চড়ে——— করবে ——————— পড়তে গেলেন।

খ) ভেবেছো এই কেশরী ——— বলে তোমরা তাকে —— করে যাবে ?

গ) দেখ মহম্মদ । এই আমার ———— এই আমার ———— ।

৮। সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দিন :

ক) সাজাহান দারাকে যে পত্র লিখেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়েছে ?

—— দারার হাতে পড়েছে

—— মহম্মদের হাতে পড়েছে

—— ঔরংজীব পথে সে পত্র সংগ্রহ করেছেন ।

খ) ঔরংজীব সাজাহানের কাছে আসলে জাহানারা কি করবেন ?

—— তিনি তাকে আপ্যায়ন করবেন

—— তিনি তাঁকে হত্যা করবেন

—— তিনি কৌশলে তাঁকে বন্দী করবেন

গ) সাজাহান নিজের মুক্তির বিনিময়ে মহম্মদকে কি দিতে চেয়েছিলেন ?

—— নিজের রাজ্য

—— দশ সহস্র মুদ্রা

—— প্রধান সেনাপতির পদ

৯। অর্থ লিখুন :

শঠ, প্রগাঢ়, আজ্ঞামত, হিতৈষী, কপট, গুপ্তভাবে, গণ্ড, বাতুল

১০। বাক্য রচনা করুন :

জলোচ্ছ্বাস, নিঃসহায়, অধীশ্বর, কৃতঘ্ন

শব্দ সম্ভার :

ভবনে	বাড়ীতে
অবস্থান	থাকা
ঘনঘটাচ্ছন্ন	ঘন মেঘের দ্বারা আবৃত
অন্তরালে	আড়ালে
কিঞ্চিৎ	কিছু
তুড়ি	দুই আঙ্গুলের ঘর্ষণের শব্দ বিশেষ
ভূমিসাৎ	ধরাশায়ী
দাবাতে	বারান্দায়
সমাগত	আসন্ন
মাষকলাই	এক রকমের ডাল
কর্ণপাত	শোনা
চাক	বাসা
মুদ্রিত	রেখাঙ্কিত
শালতি	নৌকো
প্রত্যুষে	সকালে
ঊষা	ভোর
অবিলম্বে	দেরী না করে
স্পৃহনীয়	আকাঙ্খিত
পরামর্শ	আলোচনা
দণ্ডায়মান	দাঁড়ানো অবস্থা
অপরাহ্ন	বিকেল
চৌকি	চারপায়ী
কল	অঙ্কুর
বোলতা	এক ধরণের হুল থাকা পতংগ

মূলপাঠ :

এখন নিজের জীবন-বিবরণ আবার বলি । চৌধুরী মহাশয়দিগের ভবনে অবস্থান কালে ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে মহা ঝড় ঘটে । সেই ঘটনা স্মৃতিতে দৃঢ় রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে । সেটা পূজার ছুটির সময়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন । অনেকে পূজার সময় কলিকাতা হইতে বাড়ি যাইতেছিল, সুতরাং পথে ঝড়ে পড়িতে হয় । আমার স্বগ্রামের একটি যুবক ও আমি দুইজনে ঝড়ের পূর্ব দিন শালতি করিয়া কালীঘাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করি । সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া জোরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হয় ও বৃষ্টি নামে । সেই বায়ু ও বৃষ্টিতে আমরা কোনো প্রকারে শালতিতে বসিয়া রাত্রি কাটাইলাম । শয়নের সুখ আর হইল না । পরদিন প্রত্যুষে যখন মেঘের অন্তরালে উষার আলোক দেখা দিল, তখন দেখিলাম, আমাদের শালতি মগরাহাট নামক স্থানের উত্তরে জালাসি নামক দ্বীপগ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তরে, বিশাল জলা ও ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে, ঝড় ও তরঙ্গের আঘাতে ধরা আন্দোলিত হইতেছে । বায়ুর বেগ এত অধিক যে সম্মুখ দিকে এক পা অগ্রসর হওয়া কঠিন । কোনো প্রকারে শালতির চালকদ্বয় জালাসি গ্রামের বাজারের ধারে গিয়া শালতি লাগাইল । আমরা লাফাইয়া তীরে উঠিলাম এবং একটি দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, আমাদের ন্যায় আরও কয়েকজন শালতির যাত্রী নানা স্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে । তখনও কাহারও মনে হয় নাই যে ঝড় অবিলম্বে ভীষণ সাইক্লোনের আকার ধারণ করিবে । সকলে পরামর্শ হইতে লাগিল যে, সকলে মিলিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া খাওয়া যাক । যাত্রীদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ এই কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন । বলিলেন, দুইজনের জন্য রাঁধাও যা, দশজনের জন্য রাঁধাও তা । আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সেই দুর্যোগের দিনে খিচুড়ি খাইতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম । কিন্তু দেবতা আর এক প্রকার বন্দোবস্ত করিলেন ।

খিচুড়ির পরামর্শ শেষ হইতে না হইতে দোকানদারের সহিত চাউল-দাউলের মূল্য নির্ধারণ হইতে না হইতে, হু হু করিয়া সাইক্লোনের বায়ু ডাকিয়া আসিল । আমাদের চক্ষের সমক্ষে কয়েকখানি চালা ঘর পড়িয়া গেল । অবশেষে যে দোকানে আমরা বসিয়াছিলাম, সে ঘর কাঁপিতে লাগিল । আমরা বিপদ গণনা করিয়া কোমর বাঁধিতে লাগিলাম । তখনো দেখি যাত্রীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তুড়ি দিয়া মনের আনন্দে 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের' ইত্যাদি কীর্তনটি গাইতেছেন । তাঁহাকে বলা গেল, 'মশাই গান রাখুন, কোমর বাঁধুন, এ ঘর

যে পড়ে !' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'রেখে দাও ঘর পড়া, গাইতে বড়ো ভালো লাগছে, শোনো শোনো কীর্তনটা শোনো ।' আর শোনো । চড়চড় করিয়া ঘর হেলিতে লাগিল, আমরা দৌড়িয়া বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটি চাপা পড়িলেন । যেই ঘরের বাহির হওয়া, অমনি আমাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল । সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বগ্রামবাসী সেই যুবক বন্ধুটির সহিত আমি হাতে হাত বাঁধিয়াছিলাম, আমাদের দুইজনকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারিল না । একখানা দোকানঘর পড়িয়া গিয়া তাহার দুখানা চাল মাটিতে পড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমরা দুজনে গিয়া তাঁহার উপরে পড়িলাম । পড়িয়া ভাঙা ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম । দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখি, সেই কীর্তনকারী ভদ্রলোকটি পূর্বকার দোকানঘরের চাল ফুঁড়িয়া উপরে উঠিতেছেন । আমাদিগকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হাসিতে লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদিগের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'বড়ো পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি । আপনারা বোধহয় ভাবছিলেন মারা পড়েছি । আরও কিছুদিন কর্মভোগ বাকি আছে কিনা, এখন কেন যাব ?' বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন । তাঁহার সেই হাসি আমার আজও মনে আছে । কতবার ভাবিয়াছি, এরূপ সুখে দুঃখে প্রসন্ন চিত্ত পাওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয় । কতগুলি মানুষ এরূপ আছে, যাহাদিগকে কিছুতেই বিষণ্ণ করিতে পারে না ।

ইহাদের অবস্থা স্পৃহণীয় ।

কিয়ৎক্ষণ তিনজনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ করা গেল যে, অদূরে রাণী রাসমণির কাছারি-বাড়ি দেখা যাইতেছে - সে গ্রামটা তাঁহারই জমিদারি - সেই কাছারিতে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক । তিনজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম । কাছারি বাড়ির নিকটস্থ হইতে না হইতে সমগ্র বাড়ি ভূমিসাৎ হইল । চারি দিকের প্রাচীর পর্যন্ত ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়া গেল ।

তখন বাত্যার প্রকোপ দুর্দান্ত দৈত্যের বিক্রমের ন্যায় হইয়াছে । চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনো দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল । স্থির করা গেল যে সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক । গিয়া দেখি সেই গ্রামের স্ত্রীলোক বালক বালিকাতে সে ঘর পরিপূর্ণ। ঘরখানি নূতন ছিল বলিয়া তখনো দণ্ডায়মান আছে । সেই গৃহস্বামী অতি বৃদ্ধ । তাহার যুবক পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া, ঘরের ভিতরে পুরিয়া, বীরের ন্যায়

কোমর বাঁধিয়াছে, এবং সেই ঝড়ে ছুটাছুটি করিয়া চারি দিকের স্ত্রীলোক বালক বালিকা সংগ্রহ করিয়া সেই ঘরে পুরিতেছে । আমরা ঘরের নিকটে পৌঁছিয়া দেখি স্ত্রীলোক ঘরে পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, আমাদের দুই বন্ধুর কিরূপ সংকোচ বোধ হইতে লাগিল । আমরা দ্বার হইতে ফিরিয়া পার্শ্বের দাবাতে গিয়া দাঁড়াইলাম । তৎক্ষণাৎ সে দাবার চালটি আমাদের মাথার উপরে পড়িয়া গেল । তখন আমরা ভাবিলাম যে, এরূপ ঘর চাপা পড়িয়া মরা অপেক্ষা বাহিরের উঠানে বসিয়া ঝড় খাওয়া ভালো । এই ভাবিয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় গৃহের ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বাবা, তোমরা কোথায় যাও ? এত লোকের যদি যায়গা হয়ে থাকে, তোমাদের দুজনের হবে ।' তখন আমরা বাধ্য হইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক, বালক-বালিকার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে না ঢুকিলেই ভালো ছিল। ক্রমে বেলা অবসান হইল । অপরাহ্ন চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল । গ্রামস্থ যাহারা সেই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা 'বাবা রে, মা রে' করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল । আমাদের শালতির চালক দুইজন আমাদের বিছানা ও কিছু কিছু জিনিসপত্র মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল । বলিল, শালতি খাল হইতে লইয়া পুকুরের ধারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে । তখন আর উদ্ধার করিবার সময় নাই, সন্ধ্যা সমাগত প্রায় । তাহাদিগকে সেই ভাঙা দাবাতে কোনো প্রকারে রাত্রি যাপন করিতে বলিয়া আমরা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাঙা ঘরে রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম ।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল । সেই গৃহের বৃদ্ধ বৃদ্ধার বীর প্রকৃতিসম্পন্ন যুবক পুত্র সমস্ত দিনের অনাহার ও গুরুতর শ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল । পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, 'ওরে, তুই মুখ হাত ধুয়ে, ওই চৌকির নীচে তোর ভাত আছে , খা ।' তখন আমরা সেই ঘরে নয়জন, আমরা বিদেশীয় পাঁচজন, ও বুড়ো বুড়ি যুবক পুত্র ও গর্ভিণী পুত্রবধু এই চারিজন । পিতা-মাতার অনুরোধ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া যুবকটি বলিল, 'বাবুরা সমস্ত দিন অনাহারে আছেন, ওঁরা ঘরে বসে থাকবেন আর আমি খাব, তা কি হয় ?' কোনো রূপেই সে খাইবে না । ইহাতে আমরা বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম, বলিলাম, 'সে কি কথা ! এই বিপদে কি কেউ আতিথ্য করতে পারে ? তুমি সমস্ত দিন ছুটাছুটি করেছ, তুমি ঐ ভাত খাও, কিছুই অন্যায় হবে না ।' সে তাহা

শুনিল না, বসিয়া রহিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, তোমাদের ঘরে আমাদের খাবার মতো কিছু আছে কি না?' যুবক কহিল, 'চাউল আছে, তা ভিজে গিয়েছে।' উত্তর 'আচ্ছা, ভিজা চাউল আমাদিগকে দাও।' সেই ভিজা চাউল লইয়া আমি সকলকে দিলাম, বলিলাম, 'ভালো লাগুক, না লাগুক আপনারা খান, তা না হলে ও ব্যক্তি খাবে না।' আমরা ভিজা চাউল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল, শালতিতে এক হাঁড়ি মাষকলাই বাড়ির জন্য লইয়া যাইতেছিলাম, সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাহির হইয়াছে। আমি সেই ভিজা কলাই আনিয়া সকলকে চাউলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। আমাদের আহারটা বড়ো মন্দ হইল না। তৎপরে শয়নের ব্যাপার। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে যতগুলি লেপকাঁথা মাদুর ছিল, সমুদয় সমাগত কম্পান্বিত বালক-বালিকাদিগকে চাপা দিবার জন্য দিয়াছিল, তাহাতে সে সমুদয় ভিজায়া গিয়াছে, কেবল দুইটি সেঁতলা মাদুর তখনো শুকনো আছে। গৃহস্বামীর পুত্র প্রস্তাব করিল যে, তাহার একটিতে তাহারা সপরিবারে শয়ন করিবে, আর একটিতে আমরা পাঁচজন শয়ন করিব। আমরা সঙ্গের লোকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া আদরের সহিত মাদুরটি লইলেন, তাহা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইল। আমি বলিতে লাগিলাম, 'ছিঃ ছিঃ। ও মাদুর নেবেন না, ওরা মাদুরে শুক।' এই প্রস্তাবে সঙ্গের পথিকরা হাসিতে লাগিলেন। 'আমরা পাঁচজনে এক মাদুরে শুই, ওরা চারজনে আর এক মাদুরে শুক। এ বিপদে আর ভদ্রতা করার সময় নাই।' এই কথাতে আমি রাগ করিয়া মাদুরের বাহিরে কাদাতে শুইয়া অগাধ নিদ্রা দিলাম।

পরদিন প্রাতে যখন চক্ষু খুলিমাম, তখন দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। আমার অগ্রেই আর সকলে জাগিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। আমি বাহিরে গিয়া দেখি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যুবক পুত্রটি আমাদের শালতি চালকদ্বয়ের সঙ্গে পুকুরে ডুবিয়া ডুবিয়া শালতিখানি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া, তাহাকে ও প্রকার জলে ডুবিতে বারণ করিলাম, কিন্তু সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিল না। ক্রমে তিনজনে শালতিখানি তুলিল। চালকদ্বয় তাহার জল ছেঁচিয়া পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণ যুবক কুলীর ন্যায় মাথায় করিয়া আমাদের জিনিসপত্র বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে, সেই সময়ে পথে পতিত একটা ভগ্ন বোলতার চাকের উপর গা দেওয়ায় তাহার পায়ে অনেকগুলি বোলতা কামড়াইয়াছে, তাহার পা ফুলিয়া উঠিতেছে, তবু সে সেই কাজ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতার উদয় হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে।

অনুশীলনী :

১। *'আশ্বিনের ঝড়'* গল্পটিতে যে ঝড়ের বর্ণনা আছে তা আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

২। কত সালে, কোথায় লেখক ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন ? কি ভাবে সেই ঝড় হতে আত্মরক্ষা করলেন ?

৩। *'বড়ো পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি / ———— কেন যাব ?'* এই উক্তিটি কার ? কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে ? এই উক্তিটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন ।

৪। *'বাবা, তোমরা কোথায় যাও ———— দুজনেরও হবে / '* কে কাকে একথা বলেছিল ? সেখানে তাঁরা কি দেখতে পেলেন ?

৫। *'ওরে, তুই মুখ হাত ধুয়ে ———— খা / '* কে কাকে কি খাওয়ার কথা বলেছিল ? যুবক তখন কি করল ? আগন্তুকরাও বা কি করলেন ? এই গল্পে যুবক চরিত্রটি আপনার কেমন লেগেছে ঘটনা পরম্পরায় বিস্তারিত আলোচনা করুন ।

৬। শালতি কি ? কারা শালতিতে কবে কোথায় যাচ্ছিলেন ? যেতে যেতে তাঁরা কিসের সম্মুখীন হলেন ?

৭। *'বৃন্দাবন ———— বিলাসিনী রাই আমাদের'* ———— কে এই গান করছিলেন ? সেই গায়কের মধ্যে তাঁরা কি দেখতে পেলেন ? এই গায়ক চরিত্র থেকে কি বোঝা যায় ?

৮। *'তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ———— করিবার নহে / '* এই উক্তিটি কার ? কাহার প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার উদয় হলো ? উহা ভাষায় বর্ণনার বহির্ভুত কেন ?

৯। আশ্বিনের ঝড় গল্পটিতে লেখক ঝড়ের বর্ণনার অন্তরালে মানব মনের কোন সত্যকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন ? আমাদের সমাজ সংসারের পক্ষে উহা কতটা কার্যকারী বলে আপনাদের মনে হয় ?

পাঠ - ৭

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রস্তাবনা :

এই রচনাটি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীবরেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা রচিত ও সংকলিত। ডঃ ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । ওনার *মঙ্গল কাব্যের ধারা* গ্রন্থগুলো একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত । তাছাড়া *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসও* তিনি রচনা করেছেন । আদিবাসীর জীবন যাপন প্রণালী ও তাদের রীতি নীতি সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন । পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ বলে সর্বজন স্বীকৃত ।

এই রচনায় আমাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে। যেদিন ভারতবাসীর স্বদেশিকতার জোয়ারে টগ-বগ করছিল সেই দিন যেন বাঙালী তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল । এই কোলকাতা শহরেরই উপকণ্ঠে সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে । এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করা হলেও এর তাৎপর্য্য ছিল আরও গভীর ।

১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল । মঙ্গল পাণ্ডের বিক্ষোভই অসন্তোষের বারুদের স্তুপে আগুন লাগিয়ে দেয় । মিরাটে দেখা দিয়েছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান । দিল্লিতে বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করা হয়েছিল । দিল্লি থেকে ক্রমে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরেছিল বেরেলি, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বিহার ও ঝাঁসিতে । নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপি, বাহাদূর শাহ, আজিম উল্লা, কুমার সিং আরও অনেকেই সেদিন

ইংরেজ শাসকদের সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন । ১৮৫৯ সালে তাঁতিয়া টোপির প্রাণদণ্ডের পর সিপাহী বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটলেও ভারতের ইতিহাসে তা গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৪৭ সালে । দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসন কাল ছিল ।

১৯০৫ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দু-টুকরো করার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । তখন সারা বাংলায় যে প্রতিবাদের ঝড় শুরু হয়, সেটাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত । এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রূপে পরিণত হয় । এই আন্দোলনে বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ দেশ নায়করা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ।

শব্দ সম্ভার :

খঞ্জর	ছোরা
প্রত্যক্ষভাবে	নিজের চোখে দেখে
ষড়যন্ত্র	চক্রান্ত
স্তম্ভিত	অবাক
স্বয়ং	নিজে
সমীপে	কাছে
স্পৃহা	ইচ্ছা
সত্ত্বা	অস্তিত্ব
আখ্যা	নাম
সংগ্রাম	যুদ্ধ
রাজনীতি	রাষ্ট পরিচালনার নীতি
রণনীতি	যুদ্ধের নিয়ম
সঙ্ঘবদ্ধ	দলবদ্ধ
স্বতন্ত্র	আলাদা
তুমুল	ভীষণ
উন্মাদনা	পাগলামি

অন্তরীন	গৃহবন্দী
অতিবাহিত	যাপন
দুরাকাঙ্খা	যে ইচ্ছা পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব
স্বদেশ প্রেমিক	নিজের দেশকে যে ভালবাসে
আত্ম সচেতন	যে নিজের বিষয়ে সজাগ
বাগ্মি শ্রেষ্ঠ	যিনি ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন
সন্ত্রাসবাদ	হিংসার পথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়
আবির্ভুত	প্রকাশিত হওয়া
ভূষিত	শোভিত, অলঙ্কৃত
অন্তর্হিত	চোখের আড়ালে

মূল পাঠ :

পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের খঞ্জরে যেদিন বাংলার রবি অস্ত গেল সেদিন ভারতের বুকে নেমে এল এক কালরাত্রি । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত একশো নব্বই বছর সমানে সেই কালরাত্রির মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবন অতিবাহিত হয়েছে । সেই অমানিশা দূর করতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে একশো নব্বই বছর ধরে সমানে ভারত সন্তানরা সংগ্রাম করেছে । সেই সংগ্রাম হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম । ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট আসন করে নিয়েছে ।

১৭৫৭ খৃঃ আমরা ইংরেজের অধীন হই । ঠিক তার একশো বছর পর পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারা ভারত জুড়ে ইংরেজের সঙ্গে এক চূড়ান্ত সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন এক মারাঠা বীরপ্র। তাঁর নাম নানাসাহেব । নানাসাহেব ছিলেন পেশওয়া বংশধর । অন্যায়ভাবে রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি ইংরেজদের দেওয়া বৃত্তি নিয়ে মনোকষ্টে দিনযাপন করছিলেন।

বিঠুরের রাজপ্রাসাদে তাঁর পরাধীনতার জ্বালা মাথা কুটে মরছিল । এমন সময় তাঁর পরিচয় হল আজিমুল্লাহ খাঁর সঙ্গে । অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজ প্রতিভা বলে তিনি ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করে বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হন । তাঁর মনেও জেগে ওঠে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবার দুরাকাঙ্খা । গত দুই শতাব্দীতে এদেশে যত স্বদেশপ্রেমিক

জন্ম গ্রহণ করেছেন আজিমুল্লাহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম । তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে নানাসাহেব তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন ।

আজিমুল্লাহ সুযোগ বুঝে ইউরোপে গিয়ে রাজনীতি ও রণনীতি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করে এলেন । ইতিমধ্যে নানাসাহেব দেশীয় বড় বড় জমিদার ও ইংরেজদের অধীন দেশী সেপাইদের সঙ্গে গোপন আলাপ আলোচনা চালিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন । দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করলেন । ঠিক হল দিল্লীর বিপ্লবকেন্দ্র থেকে উত্থানের আদেশ এলে এক সঙ্গে সারা ভারত জুড়ে বিপ্লবীরা গর্জে উঠবে । শেষ পর্যন্ত একজন বিপ্লবী শ্রীমঙ্গল পাণ্ডের উত্তেজনার ফলে সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল । নির্দিষ্ট দিনের আগেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল । এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার আগেই স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লব ঘোষণার ফলে এই সংগ্রাম পরিণামে পরাভূত হল । সেই বিপ্লবীদের সমরানায়ক রূপে তান্তিয়া তোপী ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই যে অপূর্ব বীরত্ব ও অসামান্য রণকৌশল দেখিয়েছিলেন তাতে বড় বড় ইংরেজ সেনাপতি পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল । সেদিন যদি না এক শ্রেণীর স্বদেশদ্রোহী, কাপুরুষ, পরপদলেহী দেশীয় রাজা আর নবাব দেশভক্ত বিপ্লবীদের পরিত্যাগ করত তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্য ভাবে চিত্রিত হত । এই বিপ্লব ভারতের ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত ।

এরপর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারত-শাসনভার গ্রহণ করলেন । দেশে পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপিত হল । কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা ভারতবাসীর মন থেকে লুপ্ত হল না । ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্মসচেতন হয়ে উঠল। তার ফলে ১৮৮৫ খৃঃ ভারতীয় 'জাতীয় মহাসভা' বা 'কংগ্রেস' স্থাপিত হল । এই কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তখনকার কংগ্রেসে ইংরেজ কর্মচারীরাও যোগদান করতেন । তখন এই কংগ্রেস দেশের ছোটখাট অভাব অভিযোগের কতকগুলি প্রস্তাব করে সরকার বাহাদুরের সমীপে নিবেদন করতেন ।

ক্রমশঃ এই কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা ও প্রভাব বাড়তে লাগল । দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠলেন । বিভিন্ন সাহিত্যের মাধ্যমে এবং সভাসমিতিতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমে বর্ধিত হতে লাগল । বাংলায় ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ভেতর দিয়ে দেশ নতুন পথের সন্ধান পেল । মুক্তি সাধনার মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীত তাঁরই সৃষ্ট ।

১৯০৫ খৃঃ ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশকে দু ভাগে ভাগ করে একভাগ আসামের সঙ্গে আর এক ভাগ বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন । এই বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হল । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গদেশের বুকে যে সাড়া জাগাল তা সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করল । সর্বভারতীয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বঙ্গভঙ্গ রোধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন । এই আন্দোলন *স্বদেশী আন্দোলন* নামেও খ্যাত। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের 'রাখী বন্ধন' উৎসব হিন্দু-মুসলমানকে প্রীতির ডোরে বাঁধল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' হল ভারতের জাতীয় সংগীত । এই প্রথম ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হল । এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার 'বঙ্গভঙ্গ' রহিত করতে বাধ্য হলেন । জাতীয় আন্দোলনে ভারতবাসীর এই তেজস্বী সম্মিলিত আত্মপ্রকাশ ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করতে সরকার অত্যাচার ও নির্যাতনের পথ বেছে নিলেন । তার ফলে সৃষ্টি হল গোপন বিপ্লবী দল ।

১৯০৭ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের বাইরে একদল বীর যুবকের চেষ্টায় স্বদেশ-বিদেশে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন চলতে থাকে । এই দলের অন্যতম কর্মী ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন । শ্রী অরবিন্দ, সূর্যসেন, কানাইলাল, প্রফুল্লচাকী, যতীন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, বারীন্দ্র কুমার, ভগত সিং প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদীদের বিভিন্ন সময়কার বিপ্লব আন্দোলনে ইংরেজ সরকার উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল । অজিত সিং, বীর সাভারকার, হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, রাজা মহেত প্রতাপ, বরকতুল্লাহ, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বীর সন্তানেরা দেশে বিদেশে আন্দোলন চালাতে লাগলেন । ইংরেজ সরকার এই বিপ্লবকে নির্যাতন, কারাবাস, মৃত্যু দণ্ডের সাহায্যে দমন করতে চাইলেন । বহু স্বদেশপ্রেমিক সবুজপ্রাণ সেই বিপ্লবের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরল । দিন দিন সরকারের দণ্ড নীতি কঠোরতর হতে লাগল ।

সেই দুর্দিনে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী । তিনি বুঝেছিলেন ভারতের এই খণ্ড-বিখণ্ড বিপ্লব দ্বারা দেশের কোন মঙ্গল হবে না । দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা যাবে না । তিনি কংগ্রেসে এসে শোনালেন নতুন আদর্শের বাণী - অহিংসা - অসহযোগ - সত্যাগ্রহ ।

ভারতবর্ষ যেন তার নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে এপর্যন্ত ভুল পথে চলছিল । এতদিনে তারা পেল তাদের প্রকৃত নেতা । এতদিন যে রাজনৈতিক আন্দোলন কেবল শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবার তা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল । ভারতের বিরাট জনতা দেশ সম্বন্ধে সচেতন হল । ভারতের বিরাট গণ-চেতনা দেখে ইংরেজ সেদিন প্রমাদ গুণলো । মহাত্মা গান্ধীর এই আন্দোলনের রূপকে সার্থক করলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, বল্লবভাই প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি জননেতারা । সারা ভারতে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে পড়ল।

চির স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র এইসময় কংগ্রেস থেকে বের হয়ে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক স্বতন্ত্র দল গঠন করলেন । তিনিও নানাভাবে দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হলেন ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল । ইংরেজের ঘরে বাইরে তখন বিপদ । গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই সময় কংগ্রেস *'ভারতছাড়'* (কুইট ইণ্ডিয়া) প্রস্তাব গ্রহণ করে আবার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল । দেশের চারিদিকে দেশভক্ত সংগ্রামীদের ধরপাকড় শুরু হল । প্রায় সকল নেতাকেই বন্দী করা হল । দেশের সাধারণ মানুষ মরিয়া হয়ে চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলল । স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গণ বিপ্লব ইতিহাসে 'আগষ্ট বিপ্লব' বলে প্রসিদ্ধ ।

এই সময় দেশের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের বাইরে চলে গেলেন । নানা স্থানে ঘুরে তিনি জাপানে এলেন । এ সময়ে জাপানে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে, মোহন সিং-এর সেনাপতিত্বে পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়গণ 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একদল সৈন্যবাহিনী গঠন করে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করবার পরিকল্পনা করেছিলেন । সুভাষচন্দ্র রাসবিহারী বসুর পরামর্শে এই সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত হলেন । নেতাজীর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ' বাহিনী ভারতকে স্বাধীন করতে এগিয়ে এল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাদ্য ও রসদের অভাবে এই অভিযান স্তব্ধ হয়ে গেল । নেতাজী হলেন অন্তর্হিত । তাঁর অমর কীর্তি ও স্বদেশপ্রেম ইতিহাসের বুকে আঁকা হল স্বর্ণাক্ষরে ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হল । ভারতের দুর্বার স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ শাসকরা গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হলেন । ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সংকল্প করল। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা তখন হিন্দু মুসলমান নেতাদের মতৈক্যের ফলে খুব জটিল হয়ে উঠেছিল । মুসলীম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র 'পাকিস্থান' দাবি করলেন । মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা অবশেষে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভারত বিভাগে সম্মত হলেন । ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট *ভারত স্বাধীন* হল । তবে তা **ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান** নামে দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল ।

অনুশীলনী :

পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন :

১। *'সিপাহী বিদ্রোহ'* কি? পলাশীর যুদ্ধের কত বছর পরে হয়েছিল ? এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কারা নিয়েছিলেন ? এই ফলাফল কি হয়েছিল ?

২। *'এই প্রথম ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হল'* - এখানে কোন আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে ? এই আন্দোলন সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন ।

৩। *'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন'* বলতে কি বোঝেন ? এর ব্যাপ্তিকাল কতটুকু ? উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী নেতার নাম করুন । এই আন্দোলন দমনে ইংরেজ সরকার কোন নীতি অবলম্বন করেছিল ?

৪। *'তিনি কংগ্রেসে এসে শোনালেন এক নতুন বাণী'* - কে কি বাণী শুনিয়েছিলেন ? এ বাণীকে নতুন বলার কারণ কি ? এই বাণী বা মন্ত্রের দ্বারা দেশ কী ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করুন ।

৫। মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা নির্ণয় করুন ।

৬। হিন্দু মুসলমান নেতাদের মতানৈক্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কি ভাবে জটিলতর করে তার পরিণামকে দুঃখজনক করেছিল তা আপনার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন ।

৭। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) ভারতের বুকে নেমে এল এক কালরাত্রি ।

খ) বহু স্বদেশপ্রেমিক সবুজ প্রাণ ———— জ্বলে পুড়ে মরল ।

গ) ভারতের বিরাট গণচেতনা ———— প্রমাদ গুনলো ।

৮। টীকা লিখুন :

ক) পলাশীর যুদ্ধ

খ) ক্লাইভ

গ) নানাসাহেব

ঘ) অমানিশা

ঙ) জাতীয় মহাসভা

চ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন

ছ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

৯। অর্থ লিখুন :

ক) অমানিশা

খ) সঙ্ঘবদ্ধ

গ) বাগ্মী

ঘ) দণ্ডনীতি

১০। পাঠ্যগত ব্যাকরণ

ক) লিঙ্গান্তর করুন :
অধীন, বীর, ইংলণ্ডেশ্বরী, সভাপতি

খ) সন্ধিবিচ্ছেদ করুন :
মনোকষ্ট, ইংলণ্ডেশ্বরী, মতানৈক্য, স্বর্ণাক্ষরে

১১। বিষয়াশ্রিত প্রশ্ন :

ক) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে কে কখন শাসন ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করেন ?

খ) প্রথম কংগ্রেস সভাপতির সম্পূর্ণ নাম কি ? তার সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম কিশোর শহীদ কে ? তার সম্পর্কে কি জানেন লিখুন ।

ঘ) আগষ্ট বিপ্লব কাকে বলে ? কোন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটি সংঘটিত হয় ?

১২। উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের নাম ছকে লিখুন :

আন্দোলনের নাম	নেতৃবৃন্দের নাম
১) সিপাহী বিদ্রোহ	
২) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন	
৩) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন	
৪) অহিংসা আন্দোলন	

পাঠ - ৮

অভাগীর স্বর্গ

প্রস্তাবনা :

এটি একটি ছোট গল্প । অর্থনৈতিক বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার ফলে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের একজন রমণীর অন্তিম ইচ্ছা কীভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তারই মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে ।

এই গল্পটির লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ১৮৭৬ সালে ও মৃত্যু ১৯৩৮ সালে । ঔপন্যাসিক হিসেবেই তিনি সুপরিচিত । তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা কম হলেও সাহিত্য গুণের দিক থেকে তা অত্যন্ত মূল্যবান । তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পে সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষতঃ বঞ্চিত মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে । তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই সংসারে যারা শুধুই দিয়েছে বিনিময়ে কিছুই পায়নি তাদের দুঃখের কথা বলার জন্যই তিনি কলম ধরেছেন । তাঁর রচিত সাহিত্যের এই বিশেষ অবদানের কথা মনে রেখেই তাঁকে *দরদী কথা সাহিত্যিক* বলা হয় ।

তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা এত সহজ ও সরল ভাষায় সহানুভূতির সঙ্গে বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি । বরং পাঠক সংখ্যার বিচারে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে গিয়েছে । এমন কি সাম্প্রতিক কালে যখন বাংলা সাহিত্যে নানারকমের বৈপ্লবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তখনও তাঁর রচনার প্রতি পাঠকদের অনুরাগ এতটুকুও ম্লান

হয়নি । শরৎচন্দ্রের রচনা তাঁর জীবিত কালেই অনুবাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের সাহিত্যনুরাগী পাঠকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল । বিশেষভাবে হিন্দী ও তেলুগু ভাষায় তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসই অনুবাদ হয়েছিল । শরৎচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক একজন হিন্দী ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক *মুন্‌শীপ্রেমচাঁদের* রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার কিছু মৌলিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । বঞ্চিত মানুষের প্রতি দরদ এই দুই লেখকেরই রচনার প্রধান প্রেরণা । রচনার এই ভাবগত সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখেই শরৎচন্দ্রকে *বাংলার প্রেমচাঁদ* আখ্যাও দেওয়া হয় ।

জাতিভেদ প্রথা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকায় সমাজে ধনী এবং উচ্চ বর্ণের মানুষেরা অনেক সামাজিক সুবিধা ভোগ করে । অন্যদিকে গরীব ও নিম্ন বর্ণের মানুষেরা সেই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় । জাত্যাভিমান এবং অর্থের অহঙ্কারে ধনী লোকেরা নীচুতলার গরীব লোকেদের ঘৃণা করে । তাদের জীবনেও যে উচ্চবর্ণের ধনী লোকেদের মত কিছু আশা আকঙ্ক্ষা থাকতে পারে উচ্চবর্ণের ধনী লোকেরা তা স্বীকার করে না । উপরন্তু গরীব লোকেদের এইধরণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তারা বিদ্রূপ করতেও দ্বিধা বোধ করে না । ধনী ও উচ্চবর্ণের লোকেদের এই ধরণের মানসিকতার জন্য গরীব লোকেদের সামান্য আকাঙ্ক্ষাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । উচ্চবর্ণের ধনী পরিবারের একজন গৃহিণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখে নীচুজাতীয়া একজন গরীব স্ত্রীলোকের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে সেও মৃত্যুর পরে ছেলের হাতের আগুন পেয়ে স্বর্গে যাবে । কিন্তু দারিদ্র এবং সমাজের বিরূপতায় তার সেই সামান্য অন্তিম ইচ্ছা ব্যর্থ হয়ে যায় । আলোচ্য গল্পটিতে এই করুণ রসাত্মক ঘটনাটির মাধ্যমে লেখক সমাজের এই বৈষম্যের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

শব্দ সম্ভার :

বর্ষীয়সী	বয়স্কা
সঙ্গতিপন্ন	আর্থিক অবস্থা ভাল
ধুমধাম	মহা সমারোহ
বিলুপ্ত	নিশ্চিহ্ন
আলতা	এক রকম লাল রং

কলরব	কোলাহল
গ্রামান্তরে	অন্যগ্রামে
খল	ঔষধ তৈরী করার পাত্র
খামোকা	মিছামিছি
অশৌচ	অস্পৃশ্য
উদ্‌ভ্রান্ত	বিচলিত
অলক্ষ্যে	অগোচরে
প্রাঙ্গনে	আঙিনায়
পূবাস্ত	সকালবেলা
অন্তেষ্টিক্রিয়া	শ্মশানের অন্তিম কাজ
উর্ধ্বষ্টে	ওপরের দিকে
মাচা	বাঁশের তৈরী খাট
হতবুদ্ধি	বুদ্ধিহারা
অশ্রাব্য	কটু
অনভিজ্ঞ	যার কোন অভিজ্ঞতা নেই
গোমস্তা	জমিদারের কর্মচারী

মূলপাঠ :

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন । বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন । তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলে পুলে হইয়াছে, জামাইরা - প্রতিবেশীর দল, চাকর বাকর - সে যেন একটা উৎসব বাঁধিয়া গেল । সমস্ত গ্রামের লোক ধুম-ধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল । মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আল্‌তা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল । বধূরা, লাল চন্দনে চর্চিত করিয়া, বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল ।

পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার, - এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা

করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়ে অলক্ষ্যে দু ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন । প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত - আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল । আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা । সে তাহার কুটীর প্রাঙ্গনের গোটাকয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না । রহিল তাহার হাটে যাওয়া ; রহিল তার বেগুন বেচা । সকলের পিছনে পিছনে—শানে আসিয়া উপস্থিত হইল । গ্রামের একান্তে, নদীর তীরে শ্মশান, সেখানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরো, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল । কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল । মনে মনে বারবার বলিতে লাগিল, ‘ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্‌গে যাচ্ছো - আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও । আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই ।’ সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধোঁয়া নীল রংয়ের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল । গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে, - মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাহার সিঁদূরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো । উর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময় একটি বছর চৌদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচল টান দিয়া কহিল, ‘হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্‌ মা, ভাত রাঁধবি নো ?’

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, ‘রাঁধবোখন রে ।’ ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া সে নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল । শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না ।

কাঙালীর মার ইতিহাস ছোট । তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী । মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায় । তাহার না আছে দিন, না আছে রাত । তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইয়া বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের । যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাগ, অভাগীকে ত্যাগ করিয়া

সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল । অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল ।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনেরয় পা দিয়েছে । সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে । এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানেন না ।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেছে । আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই খেলিনে মা ?'

'বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, - এখন আর ক্ষিদে নেই ।'

ছেলে বিশ্বাস করিল না ।

'না, ক্ষিদে নেই বই কি ? কই, দেখি তোর হাঁড়ি ?'

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে । সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল । তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল । তখন সে সম্মুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল । এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না ; - কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্‌ণ ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই । এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। একহাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, 'মা তোর গা যে গরম, কেন তুই রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি ?'

অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল । ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া - বলিল, - 'কাঁথাটা পেতে দেব মা, শুবি ?'

মা চুপ করিয়া রহিল । কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল মাচার উপর হতে ছোট বালিশটি পাতিয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, 'কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই ।' কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, 'জলপানির পয়সা দুটো তাহলে দেবে না মা ।'

(৩)

অভাগীর জীবন নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল । বিস্তৃতি বেশী নয়, সামান্যই, বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে । গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাহার বাস । কাঙালী গিয়া কাঁদা-কাটা করিল, হাতে পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল । তিনি আসিলেন না, গোটাচারেক বড়ি দিলেন । তাহার কত কি আয়োজন ! খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস । - কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, ‘কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা ?’ হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া কহিল, ‘ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী দুলের কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না ।’

দিন দু-তিন করিয়া এমনি গেল । প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগে জানিত, হরিণের শিঙঘষা জল, গেঁটে - কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইতে দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল । ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, ‘কোব্‌রেজের বাড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে ? আমি এমনি ভাল হব ।’

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, ‘তুই বড়ি ত খেলিনে মা, উনুনে ফেলে দিলি এমনি কি কেউ সারে ?’

‘আমি এমনি সেরে যাবো । তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে আছি ।’

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল । না পারিল ফেন ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে । উনান তাহার জ্বলে না, - ভিতরে জল পড়িয়া ধোঁয়া হয়, ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, মায়ের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল । নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমত উপদেশ দিতে গিয়া ক্ষীণকণ্ঠে থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল জল পড়িতে লাগিল । গ্রামে

ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত । পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল । কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, 'এইবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা ?'

'কাকে মা ।'

'ওই যে, ও গাঁয়ে উঠে গেছে !'

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, 'বাবাকে ?'

অভাগী চুপ করিয়া রহিল ।

কাঙালী বলিল, 'সে আসবে কেন মা ?'

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, 'গিয়ে বলবি - মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায় ।'

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, - 'একটু কাঁদা-কাটা করিস, বাবাকে বলিস, মা যাচ্ছে ।'

একটু থামিয়া কহিল, 'ফেরবার সময় নাপতে বউদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস কাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে । আমাকে বড় ভালবাসে ।'

(৪)

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই, মুখের ওপরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে । কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, 'মাগো, বাবা এসেছে - পায়ের ধূলো নেবে যে !'

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল । এই মৃত্যু পথযাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল ।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল । পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেউ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত । বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'দাও বাবা একটু পায়ের ধূলো ।'

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল । জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, আশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর লয় নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু পায়ের ধুলো দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল । রাখালের মা কহিল, 'এমন সতী লক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে আমাদের এ দুলের ঘরে জন্মালো কেন ? এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা, কাঙালীর হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিল ।'

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া একথা যেন তীরের মত বিঁধিল ।

সেদিনের দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না । কি জানি এত ছোট জাতের জন্য স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয় ; কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে ।

কুটির প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় বসাইয়া দিল । কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, 'এ কি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস ?'

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল । কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, -'বাঃ ! এ যে আমার মায়ের হাতের পোঁতা গাছ, দারোওয়ানজী ! বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?'

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না । হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই । তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে

পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন । কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাত ধরিয়া সেই অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিল।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত মুখ নাড়িয়া জানাইল এ সব চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না ।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন, গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা । লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারিবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল । সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয় । তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অত বড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ । বাংলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না । সদ্যোমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল । বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া জমিদার অধর রায় কহিলেন, ‘কে রে ?’

‘আমি কাঙালী । দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে ।’

‘বেশ করেছে । হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি ?’

কাঙালী কহিল, ‘না বাবু মশায়, বাবা গাছ কাটিতেছিল - আমার মা মরেছে - --’ বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না ।

সকালবেলা এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন । ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি । ধমক দিয়া বলিলেন, ‘মা মরেছে তা যা, নীচে নেবে দাঁড়া । ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে । কি জাতের ছেলে তুই ?’

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গনে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘আমরা দুলে ।’

অধর কহিলেন ‘দুলে ! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি ?’

কাঙালী বলিল, 'মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে । তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সকলে শুনেছে যে ।' মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার সমস্ত অনুরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল ।

অধর কহিলেন, 'মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্‌গে । পারবি ?'

কাঙালী জানিত, তাহা অসম্ভব । তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দি পিসি একটা টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে, সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে । সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, 'না ।'

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, 'না, ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেলগে যা । কার বাবার গাছে তোর বাবা কুড়ুল ঠেকাতে যায় ? - পাজি হতভাগা নচ্ছার।'

কাঙালী বলিল, 'সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবু মশায় । সে যে আমার মায়ের হাতের পোঁতা গাছ ।'

'হাতে পোঁতা গাছ । পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত ।'

পাঁড়ে আসিয়া গলা ধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীরাই পারে ।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিল, দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল । কেন সে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়া পাইল না ।

গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না । পড়িলে এ চাকুরি তাহার জুটিত না । কহিলেন, 'পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কিনা । থাকে ত জাল টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দাও । হারামজাদা পালাতে পারে ।'

মুখুজ্যে বাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন - মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি । সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে । বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া

ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, 'ঠাকুরমশাই আমার মা মরে গেছে ।'

'তুই কে ? কি চাস তুই ?'

'আমি কাঙালী । মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে ।'

'তা দিগে না ।'

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, 'ও বোধহয় একটা গাছ চায় ।' এই বলিয়া সে ঘটনাকে প্রকাশ করিয়া কহিল ।

মুখুজ্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'শোন্ আব্দার, আমারই কত কাঠের দরকার, - কাল বাদে পরশু কাজ । যা, যা, এখানে কিছু হবে না, - এখানে কিছু হবে না।' এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন ।

ভট্টাচার্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিল । তিনি বলিলেন, 'তোদের জেতে কে কবে মড়া পোড়ায় রে ? যা মুখে একটু নুড়ো জেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দেগে ।'

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, 'দেখছেন, ভট্টাচার্য মশাই, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায় ।' এইকথা বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না । এই ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়ো হইয়া গিয়াছিল । নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল । রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া দিল । তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল ।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত, - শুধু সেই পোড়া ও খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী উর্ধ্বদৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল ।

অনুশীলনী :

১। '*অভাগীর স্বর্গ*' নামকরণের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন ।

২। মুখোপাধ্যায় গৃহিণীর শবদাহ দেখতে গিয়ে অভাগীর মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল? চিতার ধোঁয়ার মধ্যে কি দেখতে পেয়েছিল ?

৩। 'কাঙালীর মার জীবন ইতিহাস ছোট' - আলোচনা করুন ।

৪। মায়ের মৃত্যুর আগে কাঙালী কি করল ? মায়ের সে কিরূপ চিকিৎসা করল ?

৫। 'এই ঘন্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন বুড়ো হইয়া গিয়াছিল ।' - এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? তার সেই ঘন্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন, সে কেন 'বুড়ো' হয়ে গিয়েছিল ?

৬। অভাগীর চরিত্র বর্ণনা করুন ।

৭। এই গল্পে বাঙলার দুর্গত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার কি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে ?

৮। উচ্চবর্ণের মানুষের হৃদয়হীনতার পরিচয় লেখক কিভাবে প্রমাণ করেছেন আলোচনা করুন ।

৯। সঠিক শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক) ঠাকুরদাস মুখুজ্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী ________ জ্বরে মারা গেলেন ।
(পাঁচদিনের, সাতদিনের)

খ) যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত ———— গেঁটে কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইতে দেওয়া ইত্যাদি ঔষধের সন্ধান দিয়া, যে যাহার কাজে গেল ।

(হরিণের শিঙ ঘষা জল, মাদুলী ঘষা জল)

গ) গ্রামে তাহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা ———— তাহার কর্তা ।

(মাধব রায়, অধর রায়)

১০। বাক্য গঠন করুন :

শান্তমুখে, ভিড়, প্রসন্ন মুখে, সচরাচর, মুষ্টিযোগ, শোকার্ত্ত, অন্তেষ্টিক্রিয়া

১১। বিপরীত শব্দ লিখুন :

ঘন, শোক, নূতন, বৃদ্ধ, উঁচু, ছোট, স্পর্শ, দিন, ক্ষুদ্র

১২। সঠিক উত্তর দিন :

ক) অভাগীর বাবার নাম রসিক ? (হ্যাঁ - না)

খ) কবিরাজ অভাগীকে চারটি বড়ি দিয়েছিলেন (হ্যাঁ - না)

গ) কাঙালীর কুটির প্রাঙ্গণে একটা জামগাছ ছিল । (হ্যাঁ - না)

ঘ) অভাগীর শব আগুনে পোড়ানো হল । (হ্যাঁ - না)

পাঠ - ৯

জন্মভূমি

প্রস্তাবনা :

এটি একটি দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান । কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ১৮৬৩ সালে ও মৃত্যু ১৯১৩ সালে । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল এম.এ. পাশ করে বিলেতে যান ও ফিরে এসে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন । সাহিত্যের আসরে দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে নাট্যকার গীতিকার ও কবি হিসেবে সুপরিচিত । পাঠ্য কবিতাটির পরিপ্রেক্ষিতে গীতিকার ও কবি হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় দেওয়াই এখানে প্রাসঙ্গিক । নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হবে ।

গীতিকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ দু ধরণের গান রচনা করেছিলেন - হাসির গান ও দেশ প্রীতিমূলক গান । তাঁর বিলাতি গৎ-ভাঙা অভিনব সহজ সুরের দেশাত্মবোধক গানগুলি সাধারণ শ্রোতাকে মাতিয়ে তুলেছিল ।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ হালকা স্বাদের কবিতা রচনা করেছেন । অথচ সাবলীলতা রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতার ভাষায় ও ছন্দে প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে এক নতুন শৈলির প্রবর্তন করেন। তাঁর 'আর্যগাথা', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', 'হাসির গান' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা ।

'জন্মভূমি' কবিতায় কবি তাঁর আপন মাতৃভূমির অপরূপ সৌন্দর্যের এক অপূর্ব কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন । এত সৌন্দর্যভরা তার মাতৃভূমিই তাঁর কাছে তুলনাহীনা এবং সব

দেশের তুলনায় রাণীর মতো । এই সর্বশ্রেষ্ঠার সন্তান হিসেবে কবি নিজের জীবনকেও ধন্য বলে মনে করেন । 'জন্মভূমি' কবিতাটি সুর-তাল-বদ্ধ গান হিসেবেও সমাধিক সুপরিচিত।

শব্দ সম্ভার :

ধান্য	ধান
সেরা	শ্রেষ্ঠ
তড়িৎ	বিদ্যুৎ
ধুম্র	ধোঁয়ার দ্বারা আবৃত
কুঞ্জ	বন
বসুন্ধরা	পৃথিবী
ঘেরা	বেষ্টিত
স্নিগ্ধ	নির্মল
হরিৎ	সবুজ
গুঞ্জরিয়া	গুণ গুণ শব্দ করে
পুঞ্জে	দলে

মূলপাঠ :

ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা,
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি ।।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে,

তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি ।।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে,
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি ।।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে -
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি ।।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন, এই দেশেতে মরি ।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি ।।

অনুশীলনী :

১। কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় লিখুন ।

২। 'জন্মভূমি' কবিতায় কবি জন্মভূমির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন ।

৩। '*আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন, এই দেশেতে মরি ।*' - কবি কোন দেশের কথা বলেছেন, কেন এই কথা বলেছেন ? এই কথার তাৎপর্য্য কি ?

৪। ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) পুষ্পে পুষ্পে ——————— ফুলের মধু খেয়ে ।
খ) এমন দেশটি ——————— আমার জন্মভূমি ।
গ) ওমা তোমার ——————— এই দেশেতে মরি ।

৫। প্রতিশব্দ লিখুন :

পুষ্প, বসুন্ধরা, চন্দ্র, তড়িৎ, হরিৎ, সেরা, ঘেরা, ধেয়ে, অলি

৬। অর্থের পার্থক্য লিখুন :

ক)	দেশ	:	দ্বেষ
খ)	তড়িৎ	:	ত্বরিত
গ)	পড়ে	:	পরে

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

এমন ————— নদী কাহার, কোথায় এমন ————— পাহাড় ।
কোথায় এমন ————— ক্ষেত্র আকাশ তলে ————— ।

পাঠ - ১০

হিমালয় ভ্রমণ

প্রস্তাবনা

এই রচনাটি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের এক কাহিনী । এই রচনার লেখক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ সালে ও মৃত্যু ১৯০৫ সালে । তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা এবং আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের লেখক । ইনি '*তত্ত্ববোধিনী*' পত্রিকা প্রকাশনের মাধ্যমে সাহিত্যে বুদ্ধিদীপ্ত বাংলা গদ্যের পথ খুলে দেন ।

আলোচ্য রচনাটি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত '*জীবনচরিত*' (১৮৯৮) এর একটি অংশ মাত্র। এই স্বরচিত জীবনচরিতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের ১৮ থেকে ৪১ বছর বয়সের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ।

এই '*হিমালয় ভ্রমণ*' অংশে লেখক তাঁর হিমালয় ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন । লেখকের নিজস্ব রচনা রীতির বৈশিষ্ট্যে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্যের নিদর্শন হিসেবে এই রচনার মূল্য অপরিসীম ।

শব্দ সম্ভার

প্রবিষ্ট	প্রবেশ করেছে এমন
হরিদ্বর্ণ	সবুজ রঙ

কেলু	পার্বত্য পাইন গাছ
অখিলমাতা	বিশ্বমাতা
সুঙ্ঘ্রী	একটি পর্বত চূড়োর নাম
ঋক্ষ	ভালুক
অজা	ছাগল ও ভেড়া
যানারোহণ	যানে চড়া
ঘনপল্লবাবৃত	ঘন পাতায় ঢাকা
স্ট্রবেরি	এক ধরণের ফল
সায়ংকালে	সন্ধ্যার সময়
পুলকিত	আনন্দিত
গোধূম	গম
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত
পদস্খলন	পা পিছলিয়ে যাওয়া
মহোচ্চতা	মহান উচ্চতা
বনাকীর্ণ	বনে আচ্ছন্ন
ভূষণ	অলঙ্কার
অবরোহণ	নামা
বিস্মৃত	ভুলে যাওয়া
সর্বনিয়ন্তা	ঈশ্বর
বিস্তর কাল	অনেক সময়
সংকট	বিপদ
মোহিত	মুগ্ধ
তিমির	অন্ধকার
উন্নতি	উচ্চতা
দারু	গাছ, কাঠ
অশ্লিষ্ট	জড়িত
আরোহণ	উঠা

ঋজু	সোজা
ঝাঁপান	এক জাতীয় দোলা
প্রহৃষ্ট	আনন্দিত
রোষান্বিতা	ক্রুদ্ধা, রাগন্বিতা
ফেনময়ী	ফেনোচ্ছল
সমুদ্রসমাগমে	সমুদ্র মিলনের জন্য
ক্রোশ	প্রায় দুই মাইল
রাজাসনে	রাজ সিংহাসনে
দীপমালা	প্রদীপের মালা
ব্যাপ্তি	বিস্তৃতি
নিবৃত্তি	নিবারণ
সর্বভুক	যে সবকিছু খায়, আগুন

মূলপাঠ

পর দিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম । অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে । মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে । যাইতে যাইতে দেখি যে বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে । অনেক তরুণবয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে ।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম । ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরো নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম । পর্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘন-পল্লবাবৃত দেখিতে বৃক্ষসকল দেখিতে পাই । তাহাতে একটি ফল কি, একটি পুষ্পও নাই । কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না । কিন্তু পর্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণ লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার । তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া

রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে, এই পুষ্পসকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদিগকে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ট্রবেরি ফলসকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুরিুত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেইসকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য দেখিবে ? তথাপি তিনি কত যত্নে কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার দেয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ। যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা ! তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনোই যাইবে না। তোমার করুণা আমার প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।'

[হর্‌গিজ্.ম মেহরে তো অজ্. লওহে দিল্ ও জাঁন রবদ্,

আঁচু নাঁ মেহ্‌রে তো অম্‌দ দর্ দিল্ ও জা জায়ে গিরিফ্‌ৎ

কে গর্ অম্ সর্ বে রবদ্ মেহ্‌রে তো অজ্. জান রব দ্।

দীবান্ - হাফিজ., ২৬৬। ১, ২।]

হফিজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য অস্তের কিছু পূর্বে সায়ংকালে সুঙ্গ্রী নামক পর্বত চূড়াতে উপস্থিত হইলাম।

দিন কখন চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না । এই উচ্চশিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম । এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোনো পর্বত নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস-স্থান । কোনো পর্বতের আপাদমস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে । তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ-বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য-কিরণে দীপ্তি পাইতেছে । কোনো পর্বত আপাদমস্তক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে । কোনো পর্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্বতের শোভা বর্ধন করিতেছে । প্রতি পর্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই । কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ-ভৃত্যের ন্যায় সর্বদা সশঙ্কিত - একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই । সূর্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্বতশৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি । দূর হইতে পর্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্যবসতির পরিচয় দিতেছে । পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করা তেমনি সহজ । এ পর্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন । ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভালো । কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ । তাহার শাখাসকল তাহার অগ্রভাগ পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখাসকল শীতকালে বহু তুষার ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্রসকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরো সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করে না । ইহা কি আশ্চর্য নহে ? ঈশ্বরের কোন্ কার্য না আশ্চর্য ? এই পর্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই দৃশ্যের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য কি মনুষ্যকৃত কোনো উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা ? এই কেলু বৃক্ষের কোনো পুষ্প হয় না । ইহা বনস্পতি, এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই । ইহাতে আলকাতরা জন্মে ।

কতক দূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম । যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার-পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন মূর্তি ধারণ করিলাম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম । পথে এক পাল অজা চলিয়া যাইতেছিল। আমার ঝাঁপানী একটা দুগ্ধবতী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল এবং বলিল, 'ইস্‌সে দুধ

মিলেগা ।' আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম । উপাসনার পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে পাইয়া আশ্চর্য হইলাম, এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম । 'সভড়নাঁ জীয়াকা তুম্ দাতা, সো মৈঁ বিসর না জাই' । সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই । তাহার পরে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম, পুনর্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া হৃষ্ট হইলাম । মধ্যে মধ্যে আফিমের ক্ষেত্র রহিয়াছে । এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য কর্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে ।

রৌদ্রের জন্য পুনর্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালি নামক পর্বতে উপস্থিত হইলাম । শুঙ্গ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্নে । এই পর্বতের তলে 'নগরী' নদী এবং ইহার নিকটেই অন্যান্য পর্বত । তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে এবং তাহা রৌপ্যপত্রের ন্যায় সূর্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে । এই শতদ্রু নদীতীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী । রামপুর যে পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাইতেছে, তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহু পথ ভ্রমণ করিতে হয় । এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে, এবং ইংরেজি ভাষাও অল্প অল্প শিখিয়াছে । শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রানার রাজধানী সোহিনী হইয়া, তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্বত ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে ।

গত কল্য সুঙ্গ্রী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্যও তদ্রুপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্নে নগরী নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহা বেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তরখণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেনময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দ করিতে সর্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র সমাগমে গমন করিতেছে । ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে । রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না । এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পরপারে গিয়া একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাঙলাতে বিশ্রাম করিলাম । এই উপত্যকাভূমি অতি

রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে একজন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তোমার নহে, সে পর্বতের গহ্বর, সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার পিতা একটি ছোট ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তিসুখ দুর্লভ।

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে 'পর্বতো বহ্নিমান' পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল, উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষসকলকে আকর্ষণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষসকল দেখিয়াছি, এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্বতের প্রজ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল। রাত্রিতে যখনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনি তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, এবং উৎসব রজনীর প্রভাতকালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায় মধ্যে মধ্যে সর্বভুক লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটী করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুপ্রহরের সময় 'দারুণ ঘাট' নামক দারুণ উচ্চ পর্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে।

আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণ ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের অশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষারবর্ষণ দর্শন করিলাম । আষাঢ় মাসে তুষার বর্ষণ সিমলাবাসীদিগের পক্ষেও আশ্চর্য যেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই সিমলাপর্বত তুষারজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্তবেশ ধারণ করে ।

২রা আষাঢ়ে এই পর্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহন নামক পর্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাজার একটি অট্টালিকা আছে । গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখনো কখনো শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন । গ্রীষ্মকালে পর্বততলে আমাদিগের দেশ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ হয়, পর্বতচূড়াতেই বারো মাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে । ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৩ই আষাঢ়ে ঈশ্বর প্রসাদাৎ নির্বিঘ্নে আমার সিমলার প্রবাস ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম ।

অনুশীলনী :

১। ‘*হিমালয় ভ্রমণ*’ রচনাটি অবলম্বনে দেবেন্দ্রনাথের পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের একটি বিবরণ দিন ।

২। ‘*হিমালয় ভ্রমণ*’ প্রবন্ধে লেখক হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন ।

৩। ‘এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই । রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তি দুর্লভ ।’ কাদের কথা বলা হয়েছে ? তাদের কিরূপ শান্তি সুখের কথা লেখক বুঝিয়েছেন ? রাজাদের তা নেই কেন ?

৪। হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ কালে পার্বত্য অঞ্চলের কোন দৃশ্য ও বস্তু দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে সংক্ষেপে আলোচনা করুন ।

৫। ‘হিমালয় ভ্রমণ কথার আদ্যন্ত মহর্ষির অধ্যাত্ম অনুভবের রসে সঞ্জীবিত ।’ - উক্তিটির যথার্থ্য বিচার করুন ।

৬। ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) এই পুষ্পসকলের সৌন্দর্য ———— বর্তমান বোধ হইল ।

খ) তোমার করুণা আমার মন ———— যাইবে না ।

গ) প্রতি পর্বতই আপনার ———— কাহাকেও শঙ্কা নাই ।

ঘ) এখানে ঈশ্বর তাহাদের ————এমন শান্তিসুখ দুর্লভ ।

ঙ) প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি ———— জ্বলন্ত রহিয়াছে ।

পাঠ - ১১
সরল থীসিস রচনা প্রণালী

প্রস্তাবনা

এটি একটি ব্যঙ্গাত্মমূলক রচনা । এই গল্পের রচয়িতা প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক । কর্মজীবনে তিনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন । তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় রচিত *'সরল থীসিস রচনা প্রণালী'* বর্তমান নিম্নাভিমুখি শিক্ষার মানের প্রতি কটাক্ষ । বর্তমান শিক্ষার মানে যে শিথিলতা দেখা দিয়েছে তা দূর না করলে জাতীয় জীবনে তার প্রতিক্রিয়া অচিরেই আত্মঘাতির তুল্য হবে । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার শিথিলতায় কিভাবে রামতনুর মতো একজন নিরেট মুর্খের পক্ষে শিক্ষার সর্ব্ব উচ্চমান নির্ধারক পি. এইচ. ডি. লাভ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কলুষিত করেছে, তার বর্ণনা রয়েছে । এইভাবে সচরাচর পি. এইচ. ডি. প্রাপ্তির করুণ চিত্রই লেখক পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

শব্দ সম্ভার

কিঞ্চিৎ	অল্প
নিরেট মুর্খ	একেবারে অশিক্ষিত
স্বেচ্ছায়	নিজের ইচ্ছায়
গবেষণা	তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ধূমাচ্ছন্ন	ধোঁয়ায় আবৃত
নীহারিকা	তারার সমষ্টি
উপলখণ্ড	কাঁক
নিমীলিত	বন্ধ
মৌলিক	আসল
গলাধঃকরণ	খেয়ে নেওয়া
কৌতুহল	আগ্রহ
নর্দমা	নালা
ইমারত	দালান
বাল্যকাল	ছোটবেলা
বর্জ্জাইস	বড়
অবাক	আশ্চর্য্য
হিতার্থে	মঙ্গলের জন্য
উচ্চাকাঙ্ক্ষী	বড় আশা যার
হতাশ	নিরাশ
নিভৃত	নীরব
শুষ্ক	শুকনো
পিরামিড	মিশরীয় কবর
ক্ষুদে	ছোট
লোষ্ট্র	ঢিল
ব্যুৎপত্তি	পাণ্ডিত্য, জ্ঞান
অজ্ঞাতসারে	না জানিয়ে অগোচরে
বিজ্ঞ	জ্ঞানী
কক্ষে	কোঠায়
ভাষ্য	বক্তব্য
দন্ত	দাঁত
সম্প্রদায়	দল

মূল পাঠ

অনেক দিন পরে পথে হঠাৎ রামতনুর সঙ্গে দেখা । জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি রামতনু, এতদিন দেখি নি, কোথায় ছিলে ?'

সে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল, - 'আজ্ঞে না, একটু কাজ ছিল ।' কাজ। তবে বোধ হয় বিবাহ করিতে গিয়াছিল ।

বলিলাম - 'কি বিবাহ নাকি ?'

সে বলিল, - 'আজ্ঞে, না একটা ডিগ্রির চেষ্টায় ।' অবাক হইলাম - রামতনু আবার কি ডিগ্রি লাভ করিবে । আটবার চেষ্টা করিয়া এম. এ. পাস করিয়াছে সে ।

- 'ডিগ্রি ? কি ডিগ্রি বাপু ?'

সে বলিল, 'আজ্ঞে, পি. এইচ. ডি. ।'

অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, - 'পি. এইচ. ডি., হোমিও ?'

লজ্জিত রামতনু বলিল, - 'আজ্ঞে না । ডক্টর অব্ ফিলসফি ।'

- 'দিল কে ?'

- 'বিশ্ববিদ্যালয় ।'

একেবারে বসিয়া পড়িলাম । মাটিতেই বসিতাম, কিন্তু পাশে একখানা বেঞ্চি ছিল। টলিতে টলিতে গিয়া তার উপরে বসিলাম । রামতনু বোধ হয় মনে করিল আমি তাহার বিদ্যার ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বসিতে বাধ্য হইলাম । বিদ্যার ধাক্কা কিনা জানি না, বিস্ময়ের ধাক্কা যে লাগিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

মনে পড়িল, রামতনুর মতো নিরেট মুর্খ আমি দুটি আর দেখি নাই । ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম. এ. পাশ করিতে যে ছয় বছর লাগে রামতনু তাহাকে বিশ বছরে পরিণত করিয়াছে। ইস্কুলে সে কয় বছর অধ্যয়ন করিয়াছে সে ইতিহাস আমার অজ্ঞাত । এখন

তাহার বয়স চল্লিশের উপরে । সেই রামতনুর পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিলাভ ! নাঃ জগতে বিস্ময়ের অন্ত নাই দেখিতেছি !

রামতনুকে পাশে বসাইয়া তাহার ডিগ্রিলাভের ইতিহাস জানিয়া লইলাম ।

রামতনু এ রহস্য প্রকাশ না করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা রাখিতে পারিলাম না । জনসাধারণের, বিশেষ করে ডিগ্রি লাভার্থীদের হিতার্থে প্রকাশ করিলাম । আশা করি ইহাতে বাঙালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের প্রভূত উপকার হইবে ।

আমি (রামতনু) এম. এ. পাস করিয়া দেখিলাম যে একটা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি না পাইলে জীবনই বৃথা ; চাকরি তো দূরের কথা, কেহ বসিতেও বলে না । কিন্তু ডক্টেরট লাভ করা সহজ নয় । অবশেষে গুরুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম ; কিন্তু আমাকে কেহ শিষ্য করিতে রাজি হয় না । কেহ বিদ্যার অভাব বলে, কেহ বুদ্ধির অভাব বলে, কেহ টাকার অভাব বলে । একজন পরামর্শ দিল, 'ডক্টেরটের পরিবর্তে মাথার চুল পাকাও, লোকে বিজ্ঞ মনে করিবে ।' আর একজন বলিল, 'আমেরিকা হইতে টাকা দিয়া একটা ডিগ্রি আনাইয়া লও ।' শ্যামবাজারের খুড়ো বলিল - 'আরে ভাই, গবেষণা শুরু করিয়া দাও । মাথা-মুণ্ডু যাহা মনে আসে লিখিয়া যাও । পুরু কাগজে ছাপিয়া ভালো করিয়া বাঁধাও, সোনার জলে নাম লিখিয়া দাও, এমন কিছুদিন করিতে থাকো, অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় তোমার বিদ্যার নর্দমা বন্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় ডক্টরেট দিয়া তোমাকে থামাইতে বাধ্য হইবে ।'

কিন্তু লিখিব কি ? অবশ্যই ভুল লিখিব - কিন্তু ভুল লিখিতে হইলেও কিছু লিখিতে হইবে ! তাই বা পাই কোথায় ? প্রায় যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা । একেবারে চারি চক্ষের মিলন । গুরু-শিষ্য পরস্পরকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিল ।

তিনি বলিলেন, - 'ডক্টরেট চাও ?'

তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন ।

তারপর আরম্ভ করিলেন, - 'বৎস, আরামতনু (এই উপসর্গটি আমার গুরুর দান) শোন । জ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, জ্ঞান সৃষ্টি করিতে হয় । যেমন ইঁট দিয়া নানারকমের ইমারত

তৈয়ারি করা হয়, তেমনি বর্ণমালার সমাবেশে জ্ঞান জগতের সৃষ্টি । আশা করি তুমি বর্ণমালা জানো । কাজেই জ্ঞানও তোমার আয়ত্ত । এখন কেবল উপযুক্ত গুরুর অভাব ।'

আমি জানাইলাম যে তাঁহাকে পাইয়া তো সে অভাবও পূর্ণ হইয়াছে । তিনি বলিলেন, 'তোমার যে শুধু গুরুর অভাব পূরণ হইয়াছে তাহা নয়, আমারও উপযুক্ত শিষ্যের অভাব মিটিয়াছে ।'

তারপর তিনি সেই ধূমাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমাকে '*সরল থীসিস্ রচনা প্রণালী*' শিক্ষা দিলেন । নীহারিকা হইতে যেমন নক্ষত্রের সৃষ্টি, সেই ধূম হইতে আমার জ্ঞানের ধ্রুবনক্ষত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল ।

তিনি বলিলেন, 'থীসিস্ রচনা প্রণালীর কয়েকটি মূলসূত্র আছে । প্রথম, থীসিস্‌কে যতদূর সম্ভব নীরস করিবে । ইহাতে কত সুবিধা দেখ । - সাধারণ পাঠক ইহা পড়িবে না, আর যত কম লোক পড়িবে তত তোমার ফাঁকি ধরা পড়িবার আশঙ্কা কম । তারপরে দেখ - পরীক্ষকগণও তোমার নীরস মরুভূমি তাড়াতাড়ি পার হইবার জন্য দ্রুত পাতা উল্টাইয়া যাইবেন, কাজেই সাপ, ব্যাঙ কি আছে লক্ষ্য করিবার সময় পাইবেন না । আবার দেখ, থীসিস্ যত বেশি শুষ্ক হইবে তত তোমার সম্বন্ধে পরীক্ষকের ধারণা উচ্চ হইবে, কারণ জ্ঞান জিনিসটা সহজ নয় । সাত্ত্বিকজ্ঞান শুষ্ক হরিতকীর মতো, কঠিন, শুষ্ক, নীরস, কটু ; শাঁস আছে কি নাই, থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড একটা বিচি ।

দ্বিতীয় - থীসিস্‌কে যত পারো দীর্ঘ করিবে । বাল্যকাল হইতে লোকে শুনিতে আরম্ভ করে যে জ্ঞানসমুদ্র অপার, এমন কি স্বয়ং নিউটনও নাকি তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করা ছাড়া আর বেশী কিছু করিতে পারেন নাই । নিরেট পাঁচশ পাতার টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজের একটা পিরামিড দেখিলে এমন কোন দুঃসাহসী পরীক্ষক আছে যাহার হৃৎকম্প না উপস্থিত হইবে ?

তৃতীয় - মনে রাখিবে শাস্ত্রের চেয়ে ভাষ্য সর্ব্বদা বড় হয় । অতএব একছত্র লিখিয়া অন্ততঃ ত্রিশছত্র তাহার ফুটনোট দিবে । ছোট, বড়, মাঝারি, নানা রকম টাইপ দিয়া, নানা ভাষায় ফুটনোট থাকে থাকে নামিয়া গেলে আপনিই পরীক্ষকের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিবে। আর যদি কোন অরসিক সত্যই পড়িবার চেষ্টা করে, তবে বেশি দূর পাড়িতে পারিবেন না, কারণ ওই ক্ষুদে বর্জ্জাইস টাইপ পড়িতে পড়িতে সে নিশ্চয় অন্ধ হইয়া যাইবে ।

চতুর্থ - এমন বিষয় নির্বাচন করিবে, যাহাতে সাধারণের কোন আগ্রহ নাই । যে বিষয় কেহ জানে না, আর জানিতেও চাহে না, সেই বিষয়ে থীসিস্ যেমন চমৎকার হয়, এমন আর কিছুতে নয় । খবরদার, জীবনের সঙ্গে থীসিসের যোগ করিতে কখনো চেষ্টা করিও না ।

বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিও, তোমার থীসিসে যেন সহজ সত্য না থাকে, জীবনের ছায়া না থাকে, জ্ঞানের তৃষ্ণার পানীয় না থাকে । মৌলিক দৃষ্টিকে সর্বদাই এড়াইয়া চলিবে। কখনও সুবোধভাষা ব্যবহার করিবে না, এবং কিছুতেই যেন থীসিসটি সুখপাঠ্য ও সরল না হয় ।

থীসিসের ভাষা প্রতি ছত্রে ছত্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে থাকিবে । প্রথম কয়েক ছত্রের আঘাতেই পরীক্ষকের দুপাটি দন্ত নির্দন্ত হইবে, তারপরে অনায়াসে সবটা তিনি গলধঃকরণ করিয়া ফেলিবেন ।'

এইরূপে প্রাথমিক ভূমিকা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, - 'বৎস, এবার নিম্নের কয়েকটি ছত্রকে তুমি থীসিসে পরিণত কর :- 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না । অবশেষে সে এক বকের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল ।'

'বৎস, এইবার পাণ্ডিত্য, অভিধান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব ও উপযুক্ত পরিমাণে অজ্ঞতা মিশাইয়া এই কয়েক ছত্রকে থীসিসে পরিণত করিয়া ফেল ।

'বাঘ ও বক শব্দের উপর জোর দিবে । কত রকম বাঘ ও বক আছে তাহার সুদীর্ঘ তালিক প্রস্তুত কর । তারপর পৃথিবীর সাহিত্যে কোথায় কোথায় বাঘের ও বকের উল্লেখ আছে সংগ্রহ কর । ইহাতেই প্রায় দেড়শত পাতা ভরিয়া যাইবে ।

'তারপরে দেখ - এই গল্পটির মূল ঈসপের লেখাতে বাঘ ছিল 'উলফ', বাংলাদেশে আসিয়া তাহা হইয়াছে 'বাঘ' । এখন এই সূত্রকে অনুসরণ করিয়া আরও পঞ্চাশ পাতা লিখিবে । এখানে গ্রীসের ও বাংলাদেশের ভুগোল লইয়া একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিবে। বলিবে যে বাংলাদেশের 'রয়াল বেঙ্গল টাইগারে'র প্রভাবে গ্রীক 'উলফ' 'বাঘ' হইয়া

উঠিয়াছে । প্রসঙ্গত সুন্দরবন, পর্তুগীজ দস্যু ও পর্তুগাল সম্বন্ধে কয়েক পাতা লিখিবে । তারপরে বাঘ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ফুটনোট লিখিবে - *হাজারিবাগ* নামের ব্যুৎপত্তি কি ? নিশ্চয় কোন সময়ে এখানে এক হাজার ব্যাঘ্র ছিল । তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিবে এখনো দুই চারটি বাঘ দেখা যায় ।

'এই ফুটনোটের ফুটনোটে বলিবে *বাগবাজার* এর মৌলিক নাম *ব্যাঘ্রবজ্র*, ইহার সঙ্গে মহাযান সম্প্রদায়ের *বজ্র* শব্দের যোগ আছে ।

'এখানে পুরাকালে একটি বৌদ্ধমঠ ছিল, বর্গীদের অত্যাচারে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তুমি একখানি প্রাচীন তাম্রলিপি হইতে এসব কথা জানিতে পারিয়াছ, তাম্রলিপিখানি এতদিন তোমার কাছেই ছিল, সম্প্রতি খোয়া গিয়াছে । তারপরে *বক* সম্বন্ধে লিখিবে, মহাভারতের ধর্মরূপী *বকের* কথা হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে যত বক পাইয়াছ উল্লেখ কর।

'তারপরে এই গল্পের রাজনৈতিক ভাষ্য করিবে - ইউরোপে হইতেছে *বাঘ*, এশিয়ায় *বক* । ইউরোপ নিজের বিপদ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য এশিয়ার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিতেছে । এইখানে 'সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যবাদ, কম্যুনিজম্, জাতীয়তা' প্রভৃতি বিষয় লইয়া একটা গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করিবে ।'

এইরূপে উপদেশ দিয়া গুরু বলিলেন, - 'যাও বৎস, এখন বাড়ি গিয়া থীসিস্ লিখিতে আরম্ভ কর । আমার কথা মনে রাখিলে নিশ্চয় কৃতকার্য হইবে ।'

গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া আমি ছয় মাস পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাগারে ঘুরিয়া সাড়ে সাতশ' পাতার এক জগদ্দাল থীসিস্ লিখিয়া ফেলিলাম এবং অবশেষে একটি শুভদিন দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করিয়া দিলাম ।

চারমাস পরে একদিন চিঠি পাইলাম যে আমার থীসিস্ মনোনীত হওয়ায় আমি ডিগ্রিলাভ করিয়াছি ।

রামতনু বলিল যে, তিনজন পরীক্ষকই একবাক্যে ওকে প্রশংসা করিয়াছেন । ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর লিখিয়াছেন, - 'এরূপ অত্যাশ্চার্য থীসিস্ যে লিখিত হইতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না । বাঙালী ছাত্রটির মধ্যে কি আছে দেখিতে কৌতুহল হয় ।'

পাঞ্জাবের প্রফেসার বলিয়াছেন, - What Bengal thinks to-day the rest of India will think to-morrow.

'আশা করিতেছি কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রেরা কি করিয়া থীসিস্ লিখিতে হয় তাহা বাঙালীর কাছ হইতে শিখিবে ।'

কলিকাতার প্রফেসার লিখিয়াছেন - 'অহো, কি প্রগাঢ় জ্ঞান ! কি সারগর্ভ চিন্তা ! অহো, কি হৃদয়গ্রাহী ভাষা ! অহো, কি ইতিহাসের অন্ধকার গুহার মধ্যে কি সাহসের সহিত প্রবেশ ! এই একখানিমাত্র গ্রন্থ রাখিয়া বাংলা সাহিত্যের আর সব পুড়াইয়া ফেলা চলে । এতদিন পরে বাঙালীর দুর্নাম ঘুচিবে । স্কলার বলিয়া খ্যাতি বাড়িবে । আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় এই পণ্ডিত প্রবরকে একখানি চেয়ার দিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন ।'

এই পর্যন্ত বলিয়া রামতনু থামিল । আমি কাঁদিব, কি হাসিব স্থির করিতে না পারিয়া বিড়ি টানিতে লাগিলাম ।

শেষে বাড়ী ফিরিয়া স্থির করিলাম বাঙালী জাতির, বিশেষ করে বাঙালী ছাত্রদের হিতার্থে ইহা প্রকাশ করা উচিত । তাই ঠিক যেমনটি শুনিয়াছিলাম তেমনি লিখিয়া কাগজে দিলাম। কেবল রামতনুর গুরুর নাম চাপিয়া গেলাম, কারণ তিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন। রামতনুর নামটাও ছদ্মনাম । আর এই প্রবন্ধের লেখকের নামটাও আমার নাম নয়, আমার সত্যনাম গোপন করিয়া এই বেওয়ারিশ নামটা ব্যবহার করিলাম ।

অনুশীলনী :

১। 'সরল থীসিস্ রচনা প্রণালী' গল্পটিতে লেখক কি বলতে চেয়েছেন ? এই গল্পটি বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কি পরিচয় বহন করে ?

২। 'আমি (রামতনু) এম. এ. পাশ ———— বলে না' । এই উক্তির মাধ্যমে লেখক বর্তমান শিক্ষার মান ও ব্যবহারিক জীবনের কি সমন্বয়ে সাধন করতে চেয়েছেন ?

৩। 'থীসিস্ রচনা প্রণালীর যে কয়েকটি মূল সূত্রের কথা লেখক বলেছেন সেই ব্যঙ্গরসাত্মক সূত্রের সঙ্গে মূল সূত্রের পার্থক্য বা সাদৃশ্য থাকলে তা নিরূপন পূর্বক আলোচনা করুন ।

৪। রামতনু যে নিরেট মুর্খ, ছাত্রজীবনে তার কি ভাবে পরিচয় পাওয়া যায় ?

৫। পি. এইচ. ডি. এর গুরুর সন্ধান করতে গিয়ে রামতনুর যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন ।

৬। রামতনুর থীসিস্ পরীক্ষা করে বিভিন্ন পরীক্ষক কি কি উক্তি করেছিলেন ?

৭। বাক্য রচনা করুন ।

দেহরক্ষা করা, জগদ্দাল, ভাষ্য

পাঠ - ১২

সাগর সঙ্গমে নবকুমার

প্রস্তাবনা :

'সাগর সঙ্গমে নবকুমার' বঙ্কিমচন্দ্র রচিত *'কপাল কুণ্ডলা'* উপন্যাসের অংশ বিশেষ। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের একটি কাহিনীর ওপর আধারিত । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮ সালে ও মৃত্যু ১৮৯৪ সালে । তিনি বাংলার সর্বপ্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক । তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে *'দুর্গেশ নন্দিনী'* বাংলায় লেখা প্রথম সার্থক উপন্যাস । তাছাড়া মৃনালিনী, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরানী তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *'বন্দেমাতরম'* মন্ত্রে তিনি ভারতের জনগণকে স্বাধীনতা লাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য খুবই জনসমাদৃত হয়েছিল । তাই তাঁকে *'সাহিত্য সম্রাট'* আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল ।

এই কাহিনীতে গ্রামের একজন নির্ভীক সরল যুবক পরোপকার করতে গিয়ে কিভাবে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাই দেখানো হয়েছে । যারা পরোপকার করে তারা প্রায়শই অন্যের দ্বারা লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হয়, কিন্তু পরোপকার করা যাদের ধর্ম, তারা অন্যের দ্বারা যতই প্রতারিত হোক না কেন প্রয়োজন হলে তারা অন্যের বিপদে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করে না । এই কাহিনীতে লেখক নবকুমারের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্যে সমাজ জীবনের এই কঠোর সত্যটিকেই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

শব্দ সম্ভার :

কুজ্ঝটিকা	কুয়াশা
দিঙ্‌নিরূপণ	দিক্‌নির্ণয়
সম্বৎসর	সারা বছর
পূর্ববৎ	আগের মত
উগ্রভাবে	ধমকের সাথে
বার দরিয়ায়	মহা সমুদ্রে
সমবিভ্যাহারিগণ	সহযাত্রীরা
উদ্‌বিগ্ন	চিন্তিত
সৈকতভূমি	বেলাভূমি
দিগন্ত	দিকের সীমা
বহর	নৌকোর দলবদ্ধ থাকা
বিঘা	মাটির পরিমাপ
ক্রুদ্ধ	রাগ
কথোপকথন	দুজনের মধ্যে কথাবার্তা
ছেদন যোগ্য	কাটার উপযুক্ত
ভৈরব কল্লোল	ভীষণ ঢেউ
উৎথিত	ওঠা
তণ্ডুল	চাল
স্বেদস্রুতি	ঘামের বিন্দু

মূল পাঠ :

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকো গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল । পর্তুগীস ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকো দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন । তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল,

নাবিকেরা দিঙনিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল । এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না । নৌকারোহীগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন । প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন । বারেক কথাবার্তা স্থগিত রাখিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাঝি আজ কত দূর যেতে পারবি ?'

মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'বলিতে পারিলাম না ।' বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । যুবক কহিলেন, 'মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না - ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে ? আপনি ব্যস্ত হইবেন না ।'

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, 'ব্যস্ত হব না ? বল কি ? বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি ?'

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, 'আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই - মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই ।'

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, 'আসব না ? তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব ?'

যুবা কহিলেন, 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে ।' বৃদ্ধ কহিলেন, 'তবে তুমি এলে কেন ?'

যুবা উত্তর করিলেন, 'আমি তো আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি ।' পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'আহা । কি দেখিলাম। জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না -

'দূরাদয়চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা ।

আভাতি বেলা লাবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধের কলঙ্করেখা ।

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল তাহাই একতান-মনা হইয়া শুনিতেছিলেন ।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, 'ও ভাই, এ তো বড়ো কাজটা খারাবি হল। এখন কি বার দরিয়ায় পড়লেম, কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝতে পারি না ।'

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর । বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোনো বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে । সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাঝি, কি হয়েছে ?' মাঝি উত্তর করিল না । কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন । বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে । চতুর্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে - আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোনো দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না । বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে । এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না । পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়-এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে । হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ-সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই । কিন্তু নব্য অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন, তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল । যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্তনাদ করিয়া উঠিল । প্রাচীন কহিলেন, 'কেনারায় পড়। কেনারায় পড় । কেনারায় পড় ।'

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ হইবে কেন ?'

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল । নব্য যাত্রী কোনোমতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, 'আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, প্রভাত হইয়াছে - চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্যোদয় হইবে । চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না । তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ করো, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক, পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে ।'

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল ।

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল ।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল । যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ । বেশি বাতাস নাই । সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বিশেষ জানিতে পারিলেন না । তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন । পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল । একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই - সেই কেবল কাঁদিল না ।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভব বেলা প্রায় এক প্রহর হইল । এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ-পীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল, 'কি ? কি মাঝি, কি হইয়াছে ?'

মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, 'রোদ উঠেছে । রোদ উঠেছে। ঐ দেখো, ডাঙা ।' যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া, কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন সূর্য প্রকাশ হইয়াছে । কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙমণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে । যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহনা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই । নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে, এমন কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না । আর, যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন সহিত মিশিয়াছে । নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দম নদীজলবর্ণ, কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ, আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই । সূর্য প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন । সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল । তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল । সঙ্গম স্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল । এই নদী এক্ষণে 'রসুলপুরের নদী' নাম ধারণ করিয়াছে ।

আরোহীদিগের স্ফূর্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে ; এই অবকাশে আরোহীগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন । আরোহীবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন । তখন নাবিকেরা তরী তীর লগ্ন করিলে আরোহীগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

স্নানাদির পর পাকের উদ্‌যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল - নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই । ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না । পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বাপু নবকুমার । তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।'

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা যাইব, কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস ।'

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না ।

'খাবার সময় বুঝা যাবে' এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন ।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই - কেবল বন মাত্র । কিন্তু সেবন দীর্ঘবৃক্ষাবলী শোভিত বা নিবিড় বন নহে, কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোনো ভূমিখণ্ডে ব্যাপিয়া আছে । নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল । পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন । কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল । নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্মে অভ্যাস ছিল না, সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভারবহন বড়ো ক্লেশকর হইল । যাহাই হউক, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোনোমতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন । কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণিক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন, এইরূপে আসিতে লাগিলেন ।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল । এ দিকে সমভিব্যাহারীগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল । তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে । সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল, অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে ।

নৌকারোহীগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশি মধ্যে ভৈরবকল্লোল উত্থিত হইল । নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে । নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় । এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদীমধ্যবর্তী হইতে লাগিল । নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রীগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল । দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে, নৌকা সামলাইতে পারিল না, প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুরের নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। একজন আরোহী কহিল, 'নবকুমার রহিল যে ।' একজন নাবিক কহিল, 'আঃ, তোর নবকুমার কি আছে ? তাকে 'শিয়ালে' খাইয়াছে ।'

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে । এইজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । এমন কি সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদশ্রুতি হইতে লাগিল । এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুরের নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহা তিলার্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না ।

যখন জলবেগে এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন । এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল । এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেইই আত্মবন্ধু নহেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম ।

পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকাচালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে । এ কাল পর্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে । দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে । বিশেষ, নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত, তাহারা কথার বাধ্য নহে, তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে । তাহাই সম্ভব । তবে এত ক্লেশস্বীকার কি জন্য ?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন । নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন ।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাস্যাস্পদ । পরোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি তাহারা চিরকাল পরোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন দিবে ; কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠারোহণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠারোহণে যাইবে, তুমি অধম - তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?

অনুশীলনী :

১। আগেকার দিনে নৌকা দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াতের প্রথা ছিল কেন ?

২। 'কেনারা কোথায়, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ হইবে কেন ?' - এই কথা কে কোন প্রসঙ্গে বলেছিল আলোচনা করুন ।

৩। 'বাপু নবকুমার । তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাইব ।' এই কথা কে কখন এবং কেন বলেছিল - আলোচনা করুন ।

৪। নবকুমার কিভাবে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিল তার বর্ণনা দিন ।

৫। আলোচ্য অংশটুকু থেকে নবকুমারের চরিত্রের কি পরিচয় পাই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচনা করুন ।

৬। যাত্রীরা কেন নবকুমারকে নির্জন দ্বীপে পরিত্যাগ করে এল ?

৭। 'তুমি অধম - তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?' - প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচনা করুন ।

৮। নবকুমার ও তার সহযাত্রী কে কি উদ্দেশ্য নিয়ে সাগর সঙ্গমে গিয়েছিল তা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দিন ।

৯। 'পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিধি শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল' - কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে ? পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের এ ধরণের আচরণ করার কারণ কি ?

১০। 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার' শীর্ষক কাহিনী অংশটিতে নবকুমারের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করুন ।

ব্যাখ্যা

ক) যাহা জগদীশ্বরের হাত ———— মূর্খ কি প্রকারে বলিবে ?

খ) আসব না ? তিনকাল ———— করিব না তো, কবে করিব ?

গ) যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি ———— সেরূপ হইতে পারে ।

ঘ) একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে ———— কেবল কাঁদিল না ।

ঙ) 'আঃ তোর নবকুমার ———— 'শিয়ালে' খাইয়াছে ।'

চ) তুমি অধম ———— আমি উত্তম না হইব কেন ?

১১। বাক্য রচনা করুন :
কুজ্ঝটিকা, বার দরিয়া, সশঙ্কচিত্তে, কোলাহল, কণ্ঠাগতপ্রাণ, পাঁচপীর

১২। শূন্যস্থান পূরণ করুন :
পরোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের ———— তাহারা চিরকাল ———— বনবাস দিবে কিন্তু যতবার ———— করুক না কেন পরের ———— করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের ———— যাইবে।

পাঠ - ১৩
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

প্রস্তাবনা

এটি একটি দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান । এই কবিতার রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালে ঢাকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । আর্থিক অনাটনের জন্য উনি অল্পবয়সেই পড়াশোনা বন্ধ করে সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তাঁকে যেতে হয় । ১৯১৯ সালে দেশে ফিরে উচ্ছ্বসিত কবিতা রচনা করে পাঠককে মাতিয়ে তোলেন । নজরুল একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীতশিল্পী । বিদ্রোহের এবং প্রেমের অকৃত্রিম আবেগ ও তীব্রতাই তাঁর সাহিত্য কর্মের প্রাণস্পন্দন । ছন্দ চাতুর্য ও শব্দ প্রয়োগই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য । বিশেষত: তদ্ভব, আরবী, ফার্সী ও হিন্দী শব্দের সম্মিলিত প্রয়োগে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সিন্ধুহিল্লোল', 'সর্বহারা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি লেখকের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত । এখানে কবি ভারতের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছেন ।

শব্দ সম্ভার

দুর্গম	যেখানে যাওয়া কষ্টকর
কান্তার	দুর্গম
দুস্তর	দুর্লঙ্ঘ
তরী	নৌকো
হিম্মৎ	সাহস
হাঁকিছে	ডাকছে
ভারী	ভয়ানক
তিমির রাত্রি	অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত
সান্ত্রী	সৈন্য
কাণ্ডারী	নেতা, কর্ণধার
গিরি	পর্বত
মরু	মরুভূমি
পারাবার	সমুদ্র
লঙ্ঘন	পার হওয়া, অমান্য করা
জোয়ান	বীর
তুফান	ঝড়
পারি	পার হওয়া
মাতৃমন্ত্র	মায়ের মন্ত্র
সন্তরণ	সাঁতার
গুরু গরজায়	গুরু গুরু শব্দে গর্জন করে
হানাহানি	মারামারি, কাটাকাটি
ত্রাণ	উদ্ধার
খঞ্জর	খড়্গ
মহাভার	গুরুদায়িত্ব
অলক্ষ্যে	অদৃশ্যে

মূল বক্তব্য

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ
কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ।
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা, সাবধান ।
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার,
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তি পণ ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার ।
গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায়, বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ ।
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার ।
কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর ।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর ।
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রান ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ।

অনুশীলনী :

১। কাণ্ডারী কাদের বলা হয়েছে ? তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে কবি কি বলতে চাইছেন ?

২। কবিতাটিতে কবি যা বলতে চেয়েছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন ।

৩। 'যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।' - সঞ্চিত ব্যথা বলতে কবি কি বলতে চেয়েছেন ? কি উপায়ে তা দূর করা সম্ভব ?

৪। 'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ ।' - জাতি অসহায় কেন ? সন্তরণ জানে না কেন বলা হয়েছে ?

৫। ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) দুর্গম গিরি ———————— যাত্রীরা হুঁশিয়ার ।

খ) তিমির রাত্রি ———————— দিতে হবে অধিকার ।

গ) অসহায় জাতি ———————— সন্তান মোর মার ।

ঘ) কাণ্ডারী , তব ———————— রাঙিয়া পুনর্বার ।

ঙ) ফাঁসির মঞ্চে ———————— কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ।

৬। অর্থ সহ বাক্য রচনা করুন :
গিরি, কান্তার, দুস্তর, সান্ত্রী, পুঞ্জিত, খঞ্জর

৭। প্রতিশব্দ লিখুন :
দিবাকর, পুনর্বার, সান্ত্রী, গিরি, সমুদ্র

৮। টীকা লিখুন :
পলাশী, ক্লাইভ

৯। গদ্যরূপ দিন :
ঘোষিয়াছে, জিজ্ঞাসে, লঙ্ঘিতে, ডুবিছে, ত্যজিবে, যেথা, উদিবে

পাঠ - ১৪

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য

প্রস্তাবনা :

এটি একটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর আধারিত রচনা । এই নিবন্ধের লেখক ডঃ বকুলচন্দ্র চৌধুরী ১৯৪২ সালে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় দীর্ঘ দিন থেকেই যুক্ত । তাঁর বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্র বিশেষভাবে সমাদৃত । তিনি ভারতীয় ভাষা সংস্থানের ভুবনেশ্বরস্থিত পূর্বাঞ্চল ভাষাকেন্দ্রে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত । ওড়িয়া ভাষায় লিখিত ''আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান প্রবেশ'' - এর যুগ্ম প্রণেতা । এখানে লেখক ভারতে প্রচলিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছে । ভারতবর্ষে প্রচলিত নানা প্রকার নৃত্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য স্বরূপ । প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্য চর্চা হয়ে আসছে। এই সব ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলীর মূলে রয়েছে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত কিছু মৌলিক নীতি । ভরতমুণি রচিত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত রীতি-নীতির ওপর আধারিত এই সব নৃত্যগুলোকে মার্গীনৃত্য বা শাস্ত্রীয় নৃত্য বলা হয় । এর পেছনে প্রাচীণ কাল থেকে যে সব কিংবদন্তীমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে তারও একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে । ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্যের চর্চা থাকলেও পরবর্তীকালে কিছু ঐতিহাসিক কারণে এই শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল । বর্তমান শতকের প্রথম পাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই নৃত্য পুনরুদ্ধার করা

সম্ভব হয়েছে । শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় । তাই এখানে নৃত্য সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেবার প্রয়াস করা হয়েছে মাত্র ।

শব্দ সম্ভার

প্রমোদ	আনন্দ
অপরিহার্য	অত্যন্ত দরকারী
কলুষিত	নোংরা
প্রয়াস	চেষ্টা
অনুপ্রাণিত	উৎসাহিত
পৌরাণিক	পুরাণে বর্ণিত
অবসান	শেষ
বৈদেশিক	বিদেশ সম্বন্ধীয়
সংমিশ্রণ	দুই বা ততোধিক জিনিসের মিলন
অভূতপূর্ব	যা আগে কখনো হয়নি
আহরণ	সংগ্রহ
অভিজন	উচ্চবংশ, আভিজাত্য
পেশাদারী	জীবিকা উপার্জনের উপায় এমন বৃত্তিধারী
প্রবর্তক	চারক
মজলিস	সভা
আধ্যাত্মিক	ভগবৎ বিষয়ক
আড়ম্বর	জাক জমক
প্রদর্শন	দেখানো
মিশ্রিত	মেশানো
পারদর্শিতা	নিপুণতা, পটুতা
খ্যাতি	যশ

মূলপাঠ

পুরাণে কথিত আছে যে ইন্দ্র এবং আরও কয়েকজন দেবতা ব্রহ্মাকে এমন একটি প্রমোদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করেছিলেন যা শোনা ও দেখা যায় । ব্রহ্মা তখন চার বেদ থেকেই নানা উপাদান সংগ্রহ করে এক নতুন নাট্যবেদ রচনা করেন । ব্রহ্মা ঋক্‌বেদ থেকে কথা, যজুর্বেদ থেকে মুদ্রা, সামবেদ থেকে রাগ আর অথর্ববেদ থেকে স্বাদ আহরণ করেছিলেন। পুরাণে আরও জানা যায় যে শিব বিশ্বের প্রথম নাচ নেচেছিলেন । এইজন্য শিবের আর এক নাম নটরাজ । ক্রমশঃ নাচ রাজসভার এক অপরিহার্য অনুষ্ঠান হয়ে উঠে । কিন্তু এই শিল্প শুধু অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না । কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের ওপরেও এর প্রভাব কিছু কম ছিল না । আর তাদের উৎসাহের ফলে নানা রকমের পল্লী-নৃত্যের উদ্ভব। দক্ষিণ ভারতের দেবদেবীর পুজোয় দেবদাসীরা খুবই উন্নত ধরণের নাচ পরিবেশন করতেন। বিদেশী শাসনের ফলে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতায় বাধা পড়াতে ভারতীয় নৃত্য শিল্পকে এক ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । সন্দেহযোগ্য লোকদের হাতে পড়াতে এই প্রাচীন শিল্প ক্রমশঃ কলুষিত হয়ে গেল । পেশাদারী নাচুনিদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্য ভদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এই শিল্পকেই পরিত্যাগ করল । আধুনিক ভারতে এই পুরোনো শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে । তার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান কোন অংশেই কম নয়। শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্য শেখানো আরম্ভ করার সাথে সাথে ভদ্র সমাজে নাচের নিন্দা কমেছে । নৃত্য শিক্ষার্থীরা আস্তে আস্তে প্রকাশ্যে অভিনয় শুরু করার সাথে সাথে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের যেন নবজন্ম লাভ হল ।

আমাদের ভারতবর্ষে যে সব নৃত্য প্রচলিত আছে সেগুলোকে প্রধানতঃ দুটিভাগে ভাগ করা যায় । একটি হল 'মার্গী' । এই নাচ শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে পরিবেশিত হয় । সাধারণতঃ 'মার্গী' নৃত্য শিক্ষিত সমাজে ও 'দেশী' নৃত্য অশিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল । পরবর্তীকালে এই দুই প্রকার নৃত্য যথাক্রমে *শাস্ত্রীয় নৃত্য* ও *লোকনৃত্য* নামে পরিচিত হয়ে সভ্য সমাজে প্রসার লাভ করেছে ।

বর্তমান শতকের প্রথমদিকে শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । সম্ভ্রান্ত সমাজে এর কোন স্থান ছিল না । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে ভারতীয় কলা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হল । এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে নৃত্যর

পুনঃ প্রতিষ্ঠার চিন্তা আরম্ভ হল । এই প্রয়াস ও প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৯১৭ সালে তিনি মণিপুরের রাস নৃত্যকে 'মণিপুরী নৃত্য' নামকরণ করে বহির্জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন । এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কেরেলার একজন বিশিষ্ট কবি ভাল্লোথোল ১৯৩১ সালে 'কেরালা কলামণ্ডলম' স্থাপন করেন ও কথাকলি নৃত্যের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়ে এই নৃত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন । মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণ আয়ার সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'দাসী অট্টম' বা 'দেবদাসী' নৃত্যকে মার্জিত করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন । ভারতবর্ষে বর্তমানে *ভরতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক, মণিপুরী, ওড়িশী* ও *কুচিপুড়ি* নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের স্থান লাভ করেছে ।

ভরত নাট্যম :

কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ অঞ্চলের মন্দিরের প্রচলিত দাসী আট্টম বা দেবদাসী নৃত্যের নতুন নাম ভরত নাট্যম । ভরতনাট্যম সবচেয়ে প্রাচীন আর বিশুদ্ধ নৃত্য । মন্দিরের নাচ থেকে এর উৎপত্তি । কিন্তু আজকাল মজলিসে আর মঞ্চেও এই নাচ পরিবেশন করা হয় । মাত্র একজন, সাধারণত একজন স্ত্রীলোক, এই নৃত্য পরিবেশন করেন । এই নৃত্যে সাজপোষাকের খুব বেশী আড়ম্বর নেই ।

মৃতপ্রায় দাসী আট্টমকে মাদ্রাজের শ্রীকৃষ্ণ আয়ার পুনরুদ্ধার করেন ও শ্রীমতী রুক্মিনীর নৃত্য নিপুণতায় বর্তমান সমাজে এই নৃত্য ভরত নাট্যম নামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় । দক্ষিণ ভারত বৈদেশিক আক্রমন থেকে দূরে থাকার জন্য ও বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বলে এই শাস্ত্রীয় নৃত্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল । এই নৃত্য প্রদর্শনে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে । এই নৃত্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যেমন, আল্লারিপু, যতিস্বরম, পদম, শব্দম ও তিল্লানা ।

কথাকলি :

কথাকলি ভারতীয় নৃত্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় । কথাকলি নৃত্য একধরণের মূকাভিনয় । সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নাচের জন্ম হয় । কেরেলার মালাবার অঞ্চল এই নৃত্যের কেন্দ্রস্থল । মালাবারের এই নাচের উদ্দীপনা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে । কথাকলি প্রায়ই

খোলা বাতাসে সারা রাত ধরে দল করে নাচ হয় । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপুত্র বীর কেরেলা বর্মা রামের চরিত্রকে নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করার জন্য একটি দল গঠন করেন । তিনি এর নাম রাখেন 'রামনাট্যম' । প্রথম অবস্থায় শুধু রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্য পরিবেশিত হত বলে 'রামনাট্যম' নামকরণ করা হয়েছিল । পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনীগুলিও এই নৃত্যে স্থান লাভ করে এবং 'রামনাট্যম' নামের পরিবর্তে 'কথাকলি' নাম ধারণ করে । কথাকলির কাহিনী লেখক হিসাবে কেরেলার কবি ভাল্লাথোলের নাম উল্লেখযোগ্য । এর ভাষা সংস্কৃত ও মালায়ালাম মিশ্রিত । কথাকলি নৃত্য 'তাণ্ডব' ও 'লাস্য' কোন একটির অন্তর্ভুক্ত নয় । এখানে উভয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় । তাই এই নৃত্যে পারদর্শিতা লাভ করতে হলে 'তাণ্ডব' ও 'লাস্য' এই দুইরকমের নাচেতেই পটু হতে হয় । এই নাচে প্রায় আটশ হাতের মুদ্রা ব্যবহার হয় । এগুলো চব্বিশটি মুখ্য মুদ্রার উপমুদ্রা । কথাকলি নাচে অভিনয় মুখ্য । তাই হস্তমুদ্রার প্রয়োগের সাথে ভাবের অভিনয় খুবই প্রয়োজনীয় ।

কথক :

কথক নাচ উত্তর ভারতের গৌরব । কথকরা উত্তর ভারতের এক নৃত্যগোষ্ঠী ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত পৌরাণিক ও কিংবদন্তী মূলক কাহিনীগুলোকে এরা নাচ, অভিনয় ও গানের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন । মোগল রাজত্বের সময় এই নাচের অভূতপূর্ব বিকাশ লাভ ঘটে ; কিন্তু এর আধ্যাত্মিক ভাবের অবসান হয় । উনবিংশ শতাব্দীতে এই নাচের পুনরুদ্ধার শুরু হল এবং সেই সময় কথক নাচের দুটি ধারা 'লক্ষ্ণৌ ঘরানা' ও 'জয়পুর ঘরানা'র সৃষ্টি হল । ঔধের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ ছিলেন লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এইজন্য এই নাচে মুসলমানী প্রভাবের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায় । রাজস্থানের হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠল জয়পুর ঘরানা । বর্তমান শতকের প্রথমভাগে পূর্ববঙ্গের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জমিদার প্যারীলাল রায়ের মেয়ে শ্রীমতী মেনকা কথক নাচ পরিবেশন করে সমগ্র বিশ্বে এই নাচকে পরিচিত করে তোলেন । ১৯৩৬ সালে তিনি বার্লিনে এই নাচ পরিবেশন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন । এই নাচের বিভিন্ন ভাগের নাম যথাক্রমে আমদ, থাট, তোড়া, টুকড়া, পরমেলু, পরণ, সালামী তৎকার, পাল্টা, চুর ও ঘুঙ্গট । তাছাড়া অন্য একটি ভাগে রয়েছে কবিতা, সঙ্গীত ও পঢ়ন্ত ।

মণিপুরী :

মণিপুর ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা রাজ্য । নাচ-গান এই অঞ্চলের লোকেদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ।

কথিত আছে একবার শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা গোপীদের সঙ্গে রাস নৃত্য করছিলেন । এত সুন্দর নাচ দেখে শিব পার্বতীরও এরকম করে নাচবার ইচ্ছে হয় । তাই তারা তাদের নৃত্যের স্থান হিসেবে মণিপুরকে বেছে নিলেন এবং এখানে নৃত্য করলেন । সেই থেকেই মণিপুরে রাস নৃত্যের প্রচলন হয়ে আসছে । পরবর্তীকালে *খম্বা* ও রাজকুমারী *থোইবী* শিব পার্বতীর এই নৃত্যকে রূপদান করেন এবং এই নৃত্য 'লাইহারওয়া' নাম ধারণ করে । এটাই মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্য ।

মণিপুরী কোন একটা নৃত্য শৈলীর নাম নয় । মণিপুরের ধর্মীয় নৃত্যগুলোকে একত্রে 'মণিপুরী নৃত্য' নামে অভিহিত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । মণিপুরী শৈলীর প্রধান নাচ হল রাস নৃত্য । এই রাস নৃত্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়েছিল । রাসনৃত্যকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা যায় ; যেমন, মহা রাস, কুঞ্জ রাস, বসন্ত রাস ও নিত্য রাস । এগুলো সবই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশিত হয় ।

মণিপুরী নাচের অন্য আর একটি ভাগ হল 'চোলম' । এতে তালের প্রাধান্যই বেশি। মৃদঙ্গ ও করতাল নিজে বাজিয়ে সেই ছন্দে নৃত্য করা চোলমের বিশেষত্ব ।

ওড়িশী :

ওড়িশাতে যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রচলন হয়ে আসছে তার নাম 'ওড়িশী' । পূর্বে এটা *ওড্র* নৃত্য নামে পরিচিত ছিল । ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর 'ওড়িশী' নামের প্রচলন হয়েছে । প্রাচীনকাল থেকেই ওড়িশাতে নাচের প্রচলন ছিল বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ওড়িশী নৃত্য প্রধানতঃ *লাস্য* শৈলীর । তাই সাধারণতঃ মেয়েরাই এই নাচ পরিবেশন করেন। শাস্ত্রে বর্ণিত চার রকমের অভিনয়, যথা *আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য* ও *সাত্বিক* এই নাচে আমরা দেখতে পাই ।

ওড়িশী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হল-এর ভঙ্গি ও লালিত্য বিশেষ করে ত্রিভঙ্গি। এই ত্রিভঙ্গিতে পা, কটি ও গ্রীবা এই তিন জায়গায় ভঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। এ নাচে পায়ের গোড়ালির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে চারটি প্রধান পাদভঙ্গির প্রচলন আছে সেগুলো হল স্তম্ভপাদ, কুম্ভপাদ, মহাপাদ এবং ধনুপাদ। তাছাড়া সূচীপাদ ও ত্রৈস্যপাদের ব্যবহারও যথেষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পদভঙ্গিতে যে নৃত্যগীতি সম্পাদিত হয় তাকে 'ভূমি' বলে। এই নাচে অনেক হস্ত মুদ্রার ব্যবহারও আছে। এই নাচের বিভিন্ন ভাগগুলো, যথাক্রমে *মঙ্গলাচরণ, বটুনৃত্য, পল্লবী, অভিনয়* ও *মোক্ষনাট*। এই নাচের বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী সংযুক্তা পাণীগ্রাহী, কুমারী কুমকুম দাস, প্রতিমা বেদি, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান এবং কুমারি যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাম উল্লেখযোগ্য।

কুচিপুড়ি :

'কুচিপুড়ি' অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত এক প্রকার নৃত্যনাটিকা। *ওড়িশী, ভরতনাট্যম* কিংবা *কত্থকের* ন্যায় এই নৃত্য একক নৃত্য নয়। এই নৃত্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত। অন্ধ্রপ্রদেশের পরম বৈষ্ণব সিদ্ধেন্দ্রযোগী এই নাচের প্রবর্তক। পূর্বে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোকে নৃত্য নাট্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হত। পরবর্তীকালে অন্ধ্রপ্রদেশে ভাগবত ধর্মের বহুল প্রচার শুরু হয়। যে বৈষ্ণব ভক্তেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে নাচ গানের মাধ্যমে ভাগবত ধর্মের প্রচার করতেন, সেই নাচ গান থেকেই জন্ম নিয়েছে কুচিপুড়ি নৃত্য। কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যের ভাষা তেলুগু ও সংস্কৃত।

এই নাচে ভরত নাট্যমের মত 'পদম' ও 'শব্দম' এর প্রচলন আছে। শব্দমে যে কয়েকটি বিশেষ বিষয় দেখা যায় সেগুলো হল বিনায়ক, কবিতা, মণ্ডুক, শব্দম ও অভিষেকম।

শ্লোকম কুচিপুড়ির একক নৃত্যাভিনয়। এতে কথক নাচের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। কুচিপুড়ি নাচের সঙ্গীত কর্ণাটিক রীতির। কুচিপুড়ি নাচের প্রধান গুরু হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী ও চিন্তা কৃষ্ণমূর্তি। তাঁরা উভয়ই কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণ।

এই নৃত্য সাধারণতঃ মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনীত হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভেই একজন এসে হাস্য কৌতুক পরিবেশন করেন এবং তারপরেই অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে এসে *গীতগোবিন্দ*

গান করে প্রার্থনা করেন ও পরে কুচিপুড়ি মন্দিরের দেবী *বালাত্রিপুরা সুন্দরী* র বন্দনা গান করেন। যে নৃত্যশিল্পীরা এই নৃত্য পরিবেশন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বেদান্ত সত্যনারায়ণ, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, রীতাদেবী ও ইন্দ্রাণী রহমান অন্যতম ।

অনুশীলনী :

১। ভারতীয় নৃত্যগুলোকে প্রধানতঃ ক' ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ? কিসের ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে ভাগ করা হয়েছে ? ভারতবর্ষে কত প্রকার শাস্ত্রীয় নৃত্য আছে ও কি কি ?

২। নিম্নলিখিত নৃত্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন :

ক) ভরত নাট্যম্
খ) কথাকলি
গ) কথক
ঘ) মণিপুরী
ঙ) ওড়িশী
চ) কুচিপুড়ি

৩। সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দিন :

ক) ভরত নাট্যমের একটি অংশের নাম (আলারিপু, বটুনৃত্য, পল্লবী)।

খ) কথাকলি কোন শৈলীর নৃত্য ? (তাণ্ডব, লাস্য, উভয়ের সংমিশ্রণ)

গ) ওয়াজিদ আলি শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হল (জয়পুর ঘরানা, কথক নাচ, লক্ষ্ণৌ ঘরানা) ।

ঘ) মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্যের নাম (রাসনৃত্য, চোলম্, লাইহারওয়া) ।

ঙ) রাসনৃত্য কোন কাহিনী অবলম্বনে পরিবেশিত হয় ? (পৌরাণিক কাহিনী, রাধা কৃষ্ণের কাহিনী, রামের কাহিনী)

চ) ওড়িশী কোন শৈলীর নৃত্য ? (লাস্য, তাণ্ডব, উভয়ের সংমিশ্রণ)

ছ) ওড়িশী নাচের বৈশিষ্ট্য হল (মূকাভিনয়, ত্রিভঙ্গি, ছন্দের তালে নৃত্য) ।

জ) কুচিপুড়ি নাচের প্রধান গুরু হিসেবে কার নাম উল্লেখযোগ্য ?
(শ্রীকৃষ্ণ আয়ার, ভোল্লাথোল, লক্ষ্মী নারায়ণ শাস্ত্রী)

৪। টীকা লিখুন :

ক) ভাগবতুলু
খ) চোলম
গ) ভূমি
ঘ) সিদ্ধেন্দ্রযোগী
ঙ) ভল্লাথোল
চ) সংযুক্তা পাণিগ্রাহী
ছ) শ্রীমতী মেনকা
জ) শ্রী কৃষ্ণ আয়ার
ঝ) খম্বা ও থোইবী
ঞ) বীর কেরল বর্মা

৫। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন ।

৬। বাক্য রচনা করুন :

কেরেলা কলামণ্ডলম
দাসী অট্টম
রামনাট্যম
লক্ষ্ণৌ ঘরানা
জয়পুর ঘরানা
মণিপুরী নৃত্য
বালত্রিপুরা সুন্দরী

পাঠ - ১৫

রামমোহন

প্রস্তাবনা

রামমোহন সম্পর্কিত এই রচনাখানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালে ও মৃত্যু ১৯৪১ সালে । তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক এবং স্বদেশ প্রেমিক । ১৯১৩ সালে সাহিত্যে তাঁর অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে সম্মানিত হন । শান্তিনিকেতন তাঁর গঠনমূলক কাজের জ্বলন্ত উদাহরণ ।

এখানে লেখক রামমোহনকে ভারতের নবযুগের পথিকরূপে বর্ণনা করেছেন । রামমোহনকে অনেক সামাজিক বাধা ও বিপত্তির মধ্যে দিয়ে সমাজ সংস্কার মূলক কাজে এগিয়ে যেতে হয়েছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধনে তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট । আর, নারী জাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা আজ আর অবিদিত নয় । সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপের জন্য তিনি সেদিন যে পৌরুষ ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, সভ্য জগত তা চিরদিন স্মরণ রাখবে । সেদিন এই সামাজিক কুসংস্কারকে আঘাত করতে তিনি যে সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামোয় দাঁড়িয়ে তা নির্ধারণ করা কল্পনারও অতীত । তাঁর কাজের উপযুক্ত মর্যাদা আজও আমরা দিতে পারি নি । তাতে রামমোহনের গৌরব এতটুকুও ম্লান হয় নি । কিন্তু আমরা নিজেরাই আমাদের মনের সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছি । যে কালে ও যে সামাজিক

পরিবেশের মধ্যে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই পরিবেশে থেকেও ওনার কালজয়ী চিন্তাধারর উন্মেষ কি ভাবে হয়েছিল সেটা বাস্তবিকই এক বিস্ময় । বর্তমান কালে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণের প্রথম দূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ।

শব্দ সম্ভার :

বিস্ময়কর	আশ্চর্য্যজনক
পাশ্চাত্য	পশ্চিম
প্রাচ্য	পূর্ব
ঘোরতর	ভীষণ
বিচ্ছেদ	আলাদা হওয়া
ঐক্য	একতা
ক্ষেত্র	জায়গা
ম্লেচ্ছ	বিধর্মীয়
ধর্মচ্যুত	ধর্ম থেকে পতিত
গণ্ডি	সীমা
উদ্যত	আগ্রহী
পরাভব	পরাজয়
সংকীর্ণতা	ছোট মনের পরিচায়ক
পারদর্শী	ওস্তাদ
সর্বগ	সবজায়গায় গমনকারী
অবিদিত	অজানা
অবমাননা	অশ্রদ্ধা, অপমান
পাথেয়	পথ চলার খরচ
অভ্যাগম	আগমন
সমন্বয়	মিলন

খব	ছোট, নীচ
আত্মঘাত	যে নিজেই নিজের হত্যাকারী
অনায়াসে	সহজে
অন্তরের	মনের, হৃদয়ের

মূলপাঠ

আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার । পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক পূর্বেই তাঁর জ্ঞান ছিল প্রাচ্য বিদ্যায় । অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড়ো মন তাঁর ছিল । বর্তমান কালে অন্তত বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি । বেদ-বেদান্তে, উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি-পারসিতেও ছিল সমান অধিকার ; শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেই সঙ্গে । যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল । অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন । শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ । এ দেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন । আর নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই । সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল । সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নি ।

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল । এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন । ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন । সেই ছিল তাঁর পাথেয় । ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবন যাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন ।

ভাবলেও বিস্ময় জন্মে যে, সেই সময়ে কী করে আমাদের দেশে তাঁর অভ্যাগম সম্ভবপর হয়েছে । তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছ

বিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব, এই ছিল তাঁদের ভয় । একথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্য বিদ্যা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন - দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চাই । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন । বুদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্যসাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা ।

আজ যদি তাঁকে আমরা ভালো করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্বলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে তাঁকে আমরা পদে পদে ঠেকিয়েছি । আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালি চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয় ।

তাঁকে কোনো বিশেষ আচারী সম্প্রদায় সহ্য করতে পারেনি, এতেই তাঁর যথার্থ গৌরবের পরিচয় । প্রচলিত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তিনি অনায়াসে জয়ধ্বনি পেতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা না করে সবাইকে জড়িয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তার বাণীকে প্রচার করে গেছেন । তাঁর এই কাজ সহজ কাজ নয় । এইজন্য তাঁকে আজ নমস্কার করি ।

আমাদের অন্তরেও মুক্তি নেই, ঘরেও মুক্তি নেই । পর পর বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে । কেননা, অন্তরের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারি নি, সকলকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি । আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ দারিদ্র এবং পরাভব যেখানে এত বড়ো সেখানে সকলকে গ্রহণ করার মতো বড় হৃদয়ও চাই । মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেই রকম বড়ো হৃদয় ছিল ।

অনুশীলনী

১। রামমোহনের শিক্ষা কি ধরণের ছিল ? তাঁর বড়ো মন ঠিক কি প্রকার কাজের উপযুক্ত ?

২। বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত কে ছিলেন ? কোন কোন শাস্ত্র ও ভাষায় তাঁর বিশেষ 'অধিকার' ছিল ? এই 'অধিকারের' বৈশিষ্ট্য কি ?

৩। কিসের আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান রামমোহনের চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল ? সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন কোন শক্তিতে?

৪। 'তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ ।' - 'সর্বগ' বুদ্ধি বলতে কি বোঝায় ?

৫। এদেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির প্রথম পরিচয় কে দিয়েছেন ? নারীজাতির প্রতি তাঁর যে বেদনাবোধ ছিল সে সম্পর্কে প্রমাণ দিন ।

৬। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশ কি ? রামমোহনের সাধনার প্রকৃত ক্ষেত্রটি কোথায়? তাঁর জীবন যাত্রাপথের 'পাথেয়' কি ছিল ?

৭। 'ম্লেচ্ছবিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব ।' - এই ভয় কাদের ছিল ? রামমোহন তাঁদের সম্মুখে কি বলেছিলেন ? তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য কি ছিল ?

৮। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা ।' - কার কোন ঘটনাকে এখানে 'আশ্চর্য' বলা হয়েছে ?

৯। 'সে আমাদেরই দুর্বলতা ।' - এখানে কোন দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে ?

১০। রামমোহনের যথার্থ গৌরবের পরিচয় কোথায় ? তাঁকে আজ 'নমস্কার' করার পেছনে যুক্তি কি ?

১১। পর পর বিদেশীরা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে কেন ? আজ আমাদের কোন কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার ?

শব্দ সম্ভার

একদা	একদিন
আকাঙ্ক্ষা	ইচ্ছা
সংকল্প	প্রতিজ্ঞা
বিমূর্ত	নিরাকার
অভীষ্ট	মনের ইচ্ছা
সিদ্ধি	পূরণ
নিহিত	লুকায়িত
বিবৃত	ব্যাখ্যা, আলোচনা, পরিবেশন
উপলব্ধি	বোধ, অনুভূতি
ঋদ্ধি	সমৃদ্ধি, উন্নতি
সমন্বিত	যুক্ত, মিলিত
সংরাব	আওয়াজ
কলরব	কোলাহল
তিমির	অন্ধকার
উদ্বেলিত	আন্দোলিত
কক্ষ	ঘর
নিরালায়	নির্জনে

মূল পাঠ

একদা পাঞ্জাবের রাভি নদীর তটে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে যে 'স্বাধীনতা' জাতির রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার বাণী তথ্য সংকষিত লক্ষ্য হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্টে সেই 'স্বাধীনতা'ই আবার জাতীয় অভীষ্টের পূর্ণতা ও মহান্ সার্থকতার বাণী হিসাবে প্রথম অভিনন্দিত হয়েছিল । অর্থাৎ যা ছিল সংকল্প তাই সিদ্ধি হয়ে দেখা দিল। এধরণের উক্তিকে ঐতিহাসিক বিচারের বাণী বলে মান্য করেও বলা চলে যে, স্বাধীনতার দাবি নিতান্ত বিশেষ কোন জাতীয় সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত ছিল না । সে দাবি অনেক বৎসর আগে থেকেই ছিল, ছিল জাতির প্রাণের আশায় ও স্বপ্নে । ইচ্ছা হয়েছিল

পাঠ - ১৬

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় ?

প্রস্তাবনা

বিগত ত্রিশ বছরের স্বাধীনতায় আমাদের প্রাপ্তি বিচিত্র । এগোচ্ছি না পিছোচ্ছি সে হিসাব কোন পরিসংখ্যানেই ধরা পড়ে না । যদিও সরকারী নথি-পত্র থেকে দেশের নানা প্রকার উন্নয়নের খবর পাই তথাপি স্বাধীনতার বিগত বছরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে শুধু হতাশার কথাই শুনতে পাই । কিন্তু এই হতাশার মূলে কি ? এই স্বাধীনতায় আমরা কী পেয়েছি, তার জবাবে আমরা দেখতে পাই আমরা নিজেরাই নিজেদের ভারতীয় ভাবতে শিখি নি । আমাদের দেশ কৃষি প্রধান অথচ কৃষিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে আছি । কোন আধুনিক প্রযুক্তিকে যথোপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাতে পারি নি। বেকারত্বের জ্বালায় যুবসমাজ আজ হতাশাগ্রস্থ । একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে যদি তার উত্তর খুঁজতে যাই, তাহলে দেখতে হয় সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি নিজেই কতটুকু দায়িত্ব পালন করছি । সরকারের সমালোচনা না করে আমি নিজেই কতখানি সমাজ সচেতন। আমরা কতখানি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ? জাতীয় সংহতি রক্ষায় আমরা কতখানি উদার? জাতীর এই দুর্দিনে আমাদের শপথ হোক রাজনৈতিক স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করা । আজ আমাদের সবচেয়ে আগে যা প্রয়োজন তা হল আত্মশুদ্ধি।

শব্দ সম্ভার

একদা	একদিন
আকাঙ্ক্ষা	ইচ্ছা
সংকল্প	প্রতিজ্ঞা
বিমূর্ত	নিরাকার
অভীষ্ট	মনের ইচ্ছা
সিদ্ধি	পূরণ
নিহিত	লুকায়িত
বিবৃত	ব্যাখ্যা, আলোচনা, পরিবেশন
উপলব্ধি	বোধ, অনুভূতি
ঋদ্ধি	সমৃদ্ধি, উন্নতি
সমন্বিত	যুক্ত, মিলিত
সংরাব	আওয়াজ
কলরব	কোলাহল
তিমির	অন্ধকার
উদ্বেলিত	আন্দোলিত
কক্ষ	ঘর
নিরালায়	নির্জনে

মূল পাঠ

একদা পাঞ্জাবের রাভি নদীর তটে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে যে 'স্বাধীনতা' জাতির রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার বাণী তথ্য সংকষিত লক্ষ্য হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্টে সেই 'স্বাধীনতা'ই আবার জাতীয় অভীষ্টের পূর্ণতা ও মহান্ সার্থকতার বাণী হিসাবে প্রথম অভিনন্দিত হয়েছিল । অর্থাৎ যা ছিল সংকল্প তাই সিদ্ধি হয়ে দেখা দিল। এধরণের উক্তিকে ঐতিহাসিক বিচারের বাণী বলে মান্য করেও বলা চলে যে, স্বাধীনতার দাবি নিতান্ত বিশেষ কোন জাতীয় সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত ছিল না । সে দাবি অনেক বৎসর আগে থেকেই ছিল, ছিল জাতির প্রাণের আশায় ও স্বপ্নে । ইচ্ছা হয়েছিল

জাতি ও জনতার মনের মাঝারে । জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার প্রস্তাবে সেই দাবি বস্তুতঃ জাতির সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার আনুষ্ঠানিক রূপে বিমূর্ত হয়েছিল ।

স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন করার অনেক কিছু আছে । কী পাইনি, এবং কী পেয়েছি ? বলা বাহুল্য এই দুই জিজ্ঞাসাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যে সব ঘটনা ও পরিমাণের তথ্য বিবৃত করতে হয়, তার মধ্যে স্বাধীনতার সফলতা অথবা বিফলতার কোন প্রমাণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা বোধহয় যথার্থ যুক্তিসংগত বলে অভিহিত হতে পারে না । এক্ষেত্রে যুক্তিবাদীর মনে এবং ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ মনস্বীর মনে একই ধারণার কলরব ধ্বনিত হয় বলে মনে করা চলে । বাঙালী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সহজ সরল ধারণার কথা, যাকে কোন কট্টর তার্কিকেরও পক্ষে 'গোঁড়া' ধারণার কথা বলে ব্যাখ্যা করবার সাহস হবে না - 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় ?' স্বাধীনতাই জাতীয় জীবনের একটি পরম সম্বল - আর্টের জন্য আর্ট, এরকম কোন নীতির অনুরূপ নীতির কথা নয়, তবু উপলব্ধি করতে হয় যে ,স্বাধীনতা যেন স্বয়ং সার্থক একটি পরিণাম । জাতির বৈষয়িক বাসনার সিদ্ধি ও ঋদ্ধি পূর্ণ প্রকারে সফল না হলে সেটা নিশ্চয় স্বাধীনতার অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না, যদিও বাস্তবতার নিয়মতন্ত্রের সত্য স্বীকার করতে হয় যে, জাতির বৈষয়িক সমুন্নতির প্রক্রিয়ার পক্ষে স্বাধীনতা একটি বিশেষ সুযোগের ও সাহায্যের সম্বল । যেমন প্রেরণার তেমনই যোগ্যতারও যোগান দিয়ে থাকে জাতির স্বাধীনতা । স্বাধীনতা নামক অবস্থার এই ঐতিহাসিক সদর্থ সম্বন্ধে বিশ্বের চিন্তাশীল মণীষীদের চিন্তায় দ্বিমতের কোন প্রশ্রয় নেই ।

অপরদিকে বিচার সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকের চিন্তায় বিশেষ প্রকারের একটি সাবধানতা আছে । বৈষয়িক সমুন্নতির ও প্রাচুর্যের দুধ ও মধুর স্রোতে সারা দেশ প্লাবিত হয়ে গেলেও তার দ্বারা এই সত্যের নিঃসংশয় প্রমাণ প্রকট হয় না যে, সেই জাতি তথা দেশের 'স্বাধীনতা' খুব সফল ও খুব সার্থক হয়েছে । তবু একটি অতিবাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার সত্য বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দীর্ঘকালের বৈষয়িক দীনতার ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের আকাঙ্ক্ষাও সমন্বিত ছিল । দুঃখের ও অভাবের দীর্ঘ তিমির যুগের অবসান হয়ে সুখের নতুন অরুণোদয় সম্ভব হবে । আশার এমনতর প্রকাশ জাতির কাব্যে, সাহিত্যেও ভাষায়িত হয়েছে । সুতরাং ত্রিশ বৎসর ধরে স্বাধীনতার অধীনে বাস করবার পর

আজ দেশের সাধারণ মানুষ তার ভাগ্য ও অবস্থার যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে, সেটা সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীনতার সার্থকতা সম্বন্ধেই সমালোচনা জাগিয়ে তুলতে পারে ।

তবু ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা, যার প্রথম আনুষ্ঠানিক উৎসবের প্রকাশ হিসাবে আজ হতে ত্রিশ বৎসর আগের এক পনেরই আগষ্টে নতুন রাষ্ট্রীয় পতাকার বর্ণগরিমা প্রভাতবেলার বাতাসে আন্দোলিত হয়েছিল, সেটা ছিল ঐতিহাসিক সত্যতারই পূর্ণ প্রকাশ । দুঃখের বিষয়, এবং বিস্ময়কর রহস্যের বিষয় বটে যে, ভারতের ভিতরে ও বাহিরে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর রাজনীতিক মতবাদ ও চিন্তক সম্প্রদায়ের প্রচারে এবং আচরণে ভারতের স্বাধীনতার সত্যতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে সংশয়ের নানা মন্তব্য উদ্বেলিত হয়েছিল । এবং সুখের কথা এই যে, সেই মিথ্যা মেঘের সংরাব আজ আর নেই । বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার যিনি মহাত্মা গান্ধীর জীবনী লিখে আরও কিছু খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তিনিও গান্ধীজীর অভিমতের দোহাই দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার সত্যতা সম্বন্ধে বিচিত্র এক সন্দেহের তত্ত্ব বিরচিত করেছেন । ফিশার লিখেছেন, 'স্বাধীনতার প্রথম পনেরই আগষ্ট (১৯৪৭), সারা দেশে যখন উৎসবে হর্ষ বিপুল হয়ে জেগেছে, তখন মহাত্মা গান্ধী বেলেঘাটার একটি দীনচেহারার ভাঙ্গা বাড়ীর একটি কক্ষের নিরালাতে বসে, উপোস করে আর চরকা কেটে এই দুঃখকর সত্য অভিব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারত স্বাধীনতা পায়নি, পেয়েছে স্বাধীনতার অসার খোসা ।' ফিশারের উক্তি নিরতিশয় ভ্রান্তি ও মিথ্যার একটি উৎকট নমুনা । গান্ধীজী স্বয়ং কলকাতাতে ও দিল্লিতে তাঁর চার-পাঁচটি প্রার্থনা সভার ভাষণে স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন যে, দেশ পূর্ণ অবাধ ও খাঁটি স্বাধীনতা পেয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 'আমার দুঃখ দেশের বহুজনের জীবন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সংঘর্ষে বিনষ্ট হয়েছে । আমি সেইজন্য স্বাধীনতার প্রথম দিবসে দেশের এই দুঃখের কথা স্মরণ করে উপবাস করছি ।'

আশা করা যায়, ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও গৌরব সম্বন্ধে কোন ভারতীয়ের মনে অদ্ভুত প্রশ্নের কোন প্রকোপ নেই।

অনুশীলনী :

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ।

ক) স্বাধীনতার দাবি কোথায় ছিল ? কবে থেকে ?

খ) জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন কোথায় হয়েছিল ?

গ) স্বাধীনতার সার্থকতা সম্বন্ধে মানুষের মনে আজ কেন সমালোচনা জেগে উঠেছে ?

ঘ) ঐতিহাসিক সত্যতার পূর্ণ প্রকাশ বলতে কোন ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে?

ঙ) ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে দুঃখের বিষয় কি ?

চ) ভারতের সম্বন্ধে সুখের বিষয় কি ?

ছ) গান্ধীজীর জীবনী লিখে কে বিখ্যাত হয়েছেন ? তিনি কোন দেশীয় ? তাঁর পেশা কি ?

জ) লুই ফিশার স্বাধীনতার সত্যতা সম্বন্ধে কি বিচিত্র সন্দেহের তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন?

ঝ) ফিশারের উক্তি কিভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে ?

ঞ) লেখক আলোচ্য প্রবন্ধের শেষে কি আশা পোষণ করেছেন ?

ট) 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় ।' - এটা কার উক্তি প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করুন ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করুন ।

ক) 'যা ছিল সংকল্প, তাই সিদ্ধি হয়ে দেখা দিল ।'

খ) 'আমার দুঃখ, দেশের বহুজনের জীবন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সংঘর্ষে বিনষ্ট হয়েছে । আমি সেইজন্য স্বাধীনতার প্রথম দিবসে দেশের এই দুঃখের কথা স্মরণ করে উপবাস করেছি ।'

গ) 'সেই মিথ্যা মেঘের সংরাব আজ আর নেই ।'

ঘ) 'দুঃখের ও অভাবের দীর্ঘ তিমিরযুগের অবসান হয়ে সুখের নতুন অরুণোদয় সম্ভব হবে ।'

পাঠ ১৭
ভারত তীর্থ

প্রস্তাবনা

'ভারততীর্থ' কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতার রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালে ও মৃত্যু ১৯৪১ সালে । রবীন্দ্রনাথ স্কুল কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ । তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক, নাট্যকার ও চিত্র শিল্পী । একজন সঙ্গীতকার হিসেবেও তাঁর অবদান অসামান্য । ১৯১৩ সালে সাহিত্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন । কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি যে দার্শনিক চিন্তাধারা, মানবিকতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর জন্য তাঁকে *বিশ্বকবি* রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।

'ভারততীর্থ' কবিতায় কবি ভারতবর্ষকে একটি তীর্থস্থানরূপে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন, এই ভারতে যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে ও তাঁদের কীর্তি এই ভারতভূমিকে তীর্থস্থানে পরিণত করেছে । তাঁরা ভারতীয়দের অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন । যারা এই ভারতভূমিকে শোষণ করতে এবং শাসন করতে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে এখানে এসেছিল তারাও ভারতীয়দের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে বিরাট ভারতীয় হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এটাই ভারতবাসীদের মহত্ব । ভারত চিরদিনই পরকে আপন ও শত্রুকে পরমবন্ধু করেছে। এই কবিতায় কবি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ভারতমাতার অভিষেকে নিজেকে যুক্ত করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ।

শব্দ সম্ভার

মোর	আমার
ভূধর	পর্বত
দুর্বার	দুর্দমনীয়
বিভেদ	পার্থক্য
আনতশিরে	মাথানত করে
হেথায়	এখানে
রণরণি	যুদ্ধের অস্ত্রের শব্দ
চিত্ত	মন
প্রান্তর	মাঠ
শোণিতে	রক্তে
অনল	আগুন
দহন	জ্বালা
ধরিত্রী	পৃথিবী
ত্বরা	তাড়াতাড়ি

মূলপাঠ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

হেথায় দাঁড়ায় দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে ।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা ।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন -
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে -
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর ।
হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো, ঘা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি ।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া ।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্ত শিখা ।
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে - আছে সে ভাগ্যে লিখা ।
এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক ।
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক ।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান ।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃস্টান ।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার ।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার ।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

অনুশীলনী

১। ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় কবি ভারতবর্ষকে তীর্থভূমি বলেছেন কেন ?

২। দলে দলে ভারতবর্ষে কারা এসেছিল ? কেন এসেছিল এবং তাদের পরিণতি কি হল ?

৩। কবি কাদের আহ্বান জানিয়েছেন এবং কেন আহ্বান জানিয়েছেন ?

৪। এই কবিতার ভারততীর্থ নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন ।

৫। ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) পশ্চিম আজি খুলিয়াছে ———— যাবে না ফিরে ।

খ) দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান ———— বিপুল নীড়ে ।

গ) মার অভিষেকে এসো ———— তীর্থনীরে ।

৬। ‘আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর ।’ - কার শোণিত কি বিচিত্র সুর ধ্বনিত হচ্ছে ।

৭। ‘সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুঃখের রক্তশিখা ।’ - কবি কোন হোমানলের কথা বলছেন ? দুঃখের রক্তশিখা কেন জ্বলছে ?

৮। গদ্যরূপ লিখুন :

মোর	লভিবে
বিরাজে	হেরো
দহিতে	নাশিবে
নমি	ত্বরা
শোণিতে	ভেদি

পাঠ - ১৮

বর্তমান ভারত

প্রস্তাবনা

''বর্তমান ভারত'' স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত একটি প্রবন্ধ । তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালে ও মৃত্যু ১৯০২ সালে । পূর্বে তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত । পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে সন্যাস গ্রহণ করেন ও স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগৎ বিখ্যাত হন । তিনি ভারতে ও ভারতের বাইরে বেদান্ত ধর্ম প্রচার করেন । শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেইজন্য সারা পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল । তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ''পরিব্রাজক'', ''প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'', ''বর্তমান ভারত'' উল্লেখযোগ্য।

এই প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন যে নব্য ভারতীয়রা ভারতীয় ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে । তাঁর মতে অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না । অর্জন না করলে কোন বস্তুই নিজের হয় না । তিনি আরও বলেছেন, আমাদের যা কিছু খারাপ তা নিশ্চয়ই আমাদের বর্জন করতে হবে । তবে অন্ধ অনুকরণের ফল কখনো ভাল হতে পারে না । অন্যের যা কিছু ভাল তা সুচিন্তিত উপায়ে গ্রহণ করতে হবে । পরিশেষে তিনি ভারতবাসীকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে মানব কল্যাণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন ।

শব্দ সম্ভার

বাহ্যজাতি	বাইরের জাতি
কিঞ্চিৎ	সামান্য
প্রতিঘাত	বিপরীত আঘাত
ক্ষিপ্রসঞ্চারী	বেগবান
আর্তনাদ	চীৎকার
আচ্ছাদিত	আবৃত
প্রতিহত	বাধা দেওয়া
বিনিদ্র	নিদ্রাহীন
উন্মেষ	বিকাশ, জাগরণ
উদ্ঘাটিত	প্রকাশিত
মর্মভেদী	হৃদয়গ্রাহী
পরিচ্ছদ	পোষাক
গর্দভ	গাধা
স্বয়ংবরা	যে স্ত্রী নিজে স্বামী নির্বাচিত করেন

মূল পাঠ

বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে । এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ । একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য-জ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতি প্রভা, অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ আশাপ্রদ পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব কাহিনী । একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ ও বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উৎথাপিত করিয়াছে, অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব দেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছেদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতনভাব, নূতনভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবীত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়,

কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে । একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান । এ বিষয় সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি ? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য - ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা - অর্থকরী বিদ্যা, উপায় - রাষ্ট্রনীতি । ভারতের উদ্দেশ্য - মুক্তি, ভাষা-বেদ, উপায়-ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে - বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি ।

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন - পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য সম্পন্ন হইব । অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মুর্খ । অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না, সিংহ চর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয় ?

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন - পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল ? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন - বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে সাবধান।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই ? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ? আমরা কি সম্পূর্ণ ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিবিদ্র ? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি ।' যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে । শিখিবার আছে, - ভয়ও আছে । কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণর সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত । একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে । তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি, কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল ।'

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা । পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচারশাস্ত্র বা বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না । শ্বেতাঙ্গ যে ভাব, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ । ইহা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল ; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা ; অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান, পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ-ভূষা, অশন-বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ ; পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে, মূর্তিপূজা দূষিত ; সন্দেহ কি ?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেব দেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও । পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব এ সর্ব বর্ণ একাকার হও । পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব দোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য - ইহার বিচার করিতেছি না, তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টি মাত্রই আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য ।

বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত-সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য-অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে । যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাঁধা আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষদের অবাধ সংমিশ্রণে প্রশ্রয় দেন। তাহাদের সহিত আমাদের অনুমাত্রও সহানুভূতি নাই । পাশ্চাত্য দেশেও দেখিয়াছি দুর্বল জাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে আপনাদিগকে স্পার্নিয়াড, পর্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয় ।

বলবানের দিকে সকলে যায়, গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে, দুর্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা । যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত । আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি । উহারা আর আমাদের নহে ।

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা-এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না - তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না - তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না - তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন তোমার ইন্দ্রিয় সুখের-নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না - তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না-তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র, ভুলিও না - নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল - আমি ভারতবাসী । ভারতবাসী আমার ভাই । বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল - ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী । বল ভাই - ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল, দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও । মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর ।

অনুশীলনী

১। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কি বলতে চেয়েছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

২। বর্তমান ভারতের কোন সমস্যার ইঙ্গিত স্বামীজী দিয়েছেন এবং পাশ্চাত্য সমাজ থেকে আমাদের কি শেখবার আছে তা আলোচনা করুন ।

৩। স্বামীজী ভারতবাসীকে কি ভুলতে মানা করেছেন এবং কেন করেছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন ।

৪। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের ভাবার্থ সংক্ষেপে আলোচনা করুন ।

৫। **পাশ্চাত্যের সাথে ভারতের কোন কোন বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য আছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করুন ।**

৬। ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের ———— কঠোর আত্মবলিদান ।
খ) পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে ———— উপায় ত্যাগ ।
গ) অপরদিকে প্রাচীন ভারত ———— গর্দভ সিংহ হয় ।
ঘ) যতদিন বাঁচি ———— মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ।
ঙ) হে ভারত, ভুলিও না ———— 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত ।
চ) বল, মূর্খ ভারতবাসী ———— আমার বার্ধক্যের বারাণসী ।

৭। সন্ধি করুন :

ক) রক্ষণাপযোগী
খ) পরানুকরণ
গ) পরানুবাদ
ঘ) পরমুখাপেক্ষী

৮। বাক্যরচনা করুন :

ক) দুর্বলতা
খ) পার্থক্য
গ) আমরা
ঘ) ব্যক্তিগত
ঙ) উপবন
চ) আত্মবলিদান
ছ) অর্থকরী বিদ্যা
জ) শিশুশয্যা

খ। বিশেষ্য থেকে বিশেষণ, বিশেষণ থেকে বিশেষ্য করুন :

ক) কাপুরুষতা
খ) দরিদ্র
গ) দুর্বল
ঘ) প্রশংসা
ঙ) মনুষ্যত্ব

পাঠ - ১৯

মনুষ্যফল

প্রস্তাবনা

'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ''কমলাকান্তের দপ্তর'' থেকে নেওয়া হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ সালে ও মৃত্যু ১৮৯৪ সালে । মূলত ঔপন্যাসিক হলেও তিনি প্রাবন্ধিক হিসেবেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেখিয়েছেন । ছাত্র-জীবনে ''সংবাদ প্রভাকর''এ কবিতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন ।

এই প্রবন্ধে লেখক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে ভিন্ন ভিন্ন ফলের সাদৃশ্য বলে বর্ণনা করেছেন । এখানে *বৃক্ষ* বলতে সংসার *বৃক্ষ* এবং বিভিন্ন প্রকারের *ফল* বলতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের *মানুষকে* বোঝানো হয়েছে । বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ফলের যেমন বিভিন্ন গুণাগুণ রয়েছে সমাজেও তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বিভিন্ন প্রকার স্বভাবসিদ্ধ গুণাগুণ রয়েছে । সেই ফল সাদৃশ্য মনুষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের চরিত্রের এক অন্তর্নিগূঢ় তত্ত্বকে তিনি এই রচনায় হাস্য-কৌতুক সহকারে পরিবেশন করেছেন ।

শব্দ সম্ভার :

আফিম	এক রকমের গাছের ফলের নেশাযুক্ত রস
সুপক্ক	ভালভাবে পাকা
ধৌত	ধোয়া

সম্প্রদায়	দল
কাঁঠাল	এক রকমের ফল
প্রত্যাশাপন্ন	আশাবাদী
খোসামোদ	তোষামোদ
কদলী	কলা
কটুভাষী	যারা খারাপ কথা বলে
করকচি	প্রথম অবস্থা
স্নিগ্ধ	ঠাণ্ডা
কাঁদি কাঁদি	অনেকগুলো একসঙ্গে
শীতল	ঠাণ্ডা
গৃহের	বাড়ীর
দন্তস্ফুট	দাঁতফোটানো
অলঙ্কার	গয়না
পুঁজি	নগদ টাকা (ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে)
অজীর্ণ	বদ হজম
কাছি	রশি, দড়ি
আকষি	লগি
শিমুল	তুলো
কোমল	নরম
অম্ল	টক
বৃন্ত	ফুলের বোঁটা
আহরিত	সংগ্রহিত
শৃগাল	শেয়াল
মাকাল	এক জাতীয় সুন্দর ফল যা কোন কাজে লাগে না
আম্রফল	আম
পানশে	জল জল স্বাদ
স্বচ্ছন্দে	মনের আনন্দে

কামিনী	নারী, মেয়ে
পারনা	ব্রত
উদর	পেট
জ্যোতির্ময়	উজ্জ্বল
পাঁক	কাদা
দগ্ধ	পোড়া
কিয়দংশ	কিছু পরিমাণ
কিয়ৎ	কিছু
বৃত্তিরূপ	অভ্যেস অনুযায়ী
মালা	নারকেলের ওপরের শক্ত অংশ
আহরণ	সংগ্রহ
দেশহিতৈষী	দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
রাঙ্গা	লাল
কুককুট	মুরগী
কুষ্মাণ্ড	কুমড়ো

মূল পাঠ

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধহয়, মনুষ্যসকল ফল বিশেষ-মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না-কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়, কোনটি শুকাইয়া ঝড়িয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে - তাহাদিগেরই ফলজ, বা মনুষ্যজ, সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজ, বা ফলজ, বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায় ; কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময় - যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয় - কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এখনকার বড়মানুষদিগের মনুষ্য-জাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলি বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়েই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস-রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দাল্না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য! যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্বাদক। যদি এ সকলর হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও; - ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও। সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ - করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র - খাইতে পায় না, কিছু রস দাও। সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না - পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর্ প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল। এ দেশের সিবিল সার্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা ঝাঁকা; আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক - পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলো আম এমন কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিঠে আছে - পাকিলে পান্‌শে। কতকগুলো জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল। সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম - জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও - যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ - বরফ দিও - বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে । কিন্তু সে গেছো কথা । কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না । স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে ? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক - কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয় । কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয় । কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না । পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন । যে বলে, সে দুর্মুখ । আমি ইহাদিগের ভৃত্য স্বরূপ ; আমি তাহা বলিব না ।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল । নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখনো কাঁদি কাঁদি পাড়ে না । কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণ - সেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে । কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা । কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে ।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা । করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর - নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয় । কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূণ্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয় । কিন্তু দুই জাতীয়, - ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল । তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম - কেমন জ্যোতির্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে - যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায় - উভয়েই চতুর্দিক আলো করিয়া থাকে । কিন্তু দেখ - দেখিয়া ভুলিও না - এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না - বড় তপ্ত । সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না - তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে । আম্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও - বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও - মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও ।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী - জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া । নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি । উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর । যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই

শীতল জল পান করিও - সকল যন্ত্রণা ভুলিবে । তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ - বৈশাখে, তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে ? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে ?

তবে ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায় । রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ি ছাড়িয়াছিল । এইজন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর ।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি । করকচি বেলায় বড় থাকে না ; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল, ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য ? তখন ইহাকে গৃহিনীপনা বলে । গৃহিনীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না । এক দিকে কন্যা বসিয়া আছেন মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন - কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না - ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল । হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন, - ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল । স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি - টাকা নহিলে ব্যবসা হয় না - ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি । দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন । বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙিয়া গেল । শেষে যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি ? যতদিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে নিদ্রা হয় না ।

তার পর মালা - এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা - কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না । নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না ; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয় । মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন বা জর্জ্ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন - মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে ।

ছোবড়া, স্ত্রীলোকের রূপ । ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ । দুই বড় অসার ; পরিত্যাগ করাই ভাল । তবে ছোবড়ায় একটি কাজ হয় - উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায় । স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে । তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান,

স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে । যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে, - তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে - তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে । আমি জানি না নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিনা, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে ?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না । অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না । পাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে ।

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি । কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল জোটে না । আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি । কিন্তু ভয় - পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে । এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ । অতএব এ যাত্রা কমলাকান্ত ভক্তিভাবে নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন । তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন - ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে ?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি । যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা -বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে । কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না । একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত ; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর । ফুলে গন্ধ মাত্র নাই, কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা । যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে । কিন্তু তাহা বড় ঘটে না । কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে ; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে ।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল । বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা । আমি অনেকদিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজ পবিত্র করিব - কিন্তু এই অধম ধুতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না । গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে । যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়ে দেয় - যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা হয় না, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয় । বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধ মধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন । প্রবন্ধ -গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে । এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে ।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি । নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দু'কেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলে । গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ - তাও নিকৃষ্ট অম্ল । তবে এক গুণ মানি - ইঁহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার । তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল । সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না । যেই কিয়ৎ পরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে । যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন । যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন - তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন - তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না, আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না । কিন্তু যাঁহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের কি যন্ত্রণা ? পদী পিসি কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না । ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত ।

আর একটি মনুষ্য ফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই । দেশী হাকিমেরা কোন ফল বল দেখি ? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। কেউ চালে তুলিয়া দিলে তবেই ইঁহারা উঁচুতে ফেলিলেন - নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান ।

যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড। তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে - দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিক, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য, কদর্য, টক।

অনুশীলনী :

১। কমলাকান্ত কতরকম ও কি কি মনুষ্য-ফলের কথা বলেছেন ?

২। সিভিল সার্ভিসের লোকেরা কোন জাতীয় ফল ও কেন ?

৩। ওনার নারীদের সম্পর্কে মতামত কি ? তারা কি জাতীয় ফল ?

৪। স্ত্রীলোকের স্নেহ, বুদ্ধি, বিদ্যা ও রূপ সম্বন্ধে কমলাকান্ত কি বলেছেন ?

৫। দেশহিতৈষী ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কমলাকান্ত কি মত পোষণ করেন ?

৬। আমাদের দেশের লেখকদের কমলাকান্ত কি বলে মনে করেন ও কেন ?

৭। দেশী হাকিমেরা কোন জাতীয় ফল ? দেশী ও বিলাতী কুমড়া বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন ?

৮। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন :

ক) মনুষ্যসকল ফল বিশেষ ———— ঔষধ প্রস্তুত হয়।

খ) সকলে আম্র খাইতে জানে না ———— স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

গ) রমণীমণ্ডলী এ সংসারে নারিকেল ———— তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা।

ঘ) নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের ———— ডাবের জলের মত আর কি আছে ?

ঙ) আমাদের দেশের লেখকদিগকে ———— আগুনে পোড়েন ভাল।

৯। অর্থসহ বাক্য রচনা করুন :

বৃন্ত	ইঁচোড়
আহরিত	দৌরাত্ম্য
তিক্ত	উদরসাৎ
কটু	নির্জন
সম্প্রদায়	কদর্য
গড়াগড়ি	ভুমোনমোহিনী

লেখক পরিচিতি

অতুলপ্রসাদ সেন

ওনার জন্ম ২০শে অক্টোবর ১৮৭৩ এবং মৃত্যু ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪ ।

অতুলপ্রসাদের আদি নিবাস মগর ফরিদপুর । বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের নিকট প্রতিপালিত হন । বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে ১৮৯৪ খ্রীঃ দেশে ফিরে আসেন । কিন্তু বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে অতুলপ্রসাদের পরিচয় সঙ্গীত ও সুরকার হিসাবে । অল্প বয়সেই তিনি সঙ্গীতরচনা শুরু করেন । গানগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায় - স্বদেশী সঙ্গীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান । ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা সকল শ্রেণীর সঙ্গীতেই পরিস্ফুট । হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর ও ঢঙ, বাউল ও কীর্তনের সুর ইত্যাদি যোগ করে তিনি বাংলা গানে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত-রীতির প্রবর্তন করেন । তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় ২০০ ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন । তাঁর মঙ্গল কাব্যের ধারার ওপরে লিখিত গ্রন্থগুলো একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত । তাছাড়া বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসও রচনা করেছেন । আদিবাসীদের জীবন যাপন প্রণালী ও তাদের রীতি নীতি সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন । পুরুলিয়া জেলার ছৌ নৃত্য সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত । উনি আমেরিকা ও ইউরোপে লোক সাহিত্য শীর্ষক বিভিন্ন আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।

কাজী নজরুল ইসলাম

ওনার জন্ম ২৪শে মে, ১৮৯৯ এবং মৃত্যু ২৯শে আগষ্ট ১৯৭৬ । বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায় নিবাস । পিতা কাজী ফকির আহমদ নজরুল বাল্যকালেই মারা যান । স্কুলের শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই নজরুল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে করাচী থেকে

ফিরে কবি পুরোপুরি কাব্যচর্চাতেই মনোনিবেশ করেন । 'অগ্নিবীণা', 'বিশের বাঁশি', 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'সর্বহারা', 'ছায়ানট', প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ । 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' 'সর্বহারা' থেকে গৃহীত ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওনার জন্ম ১৫ই মে ১৮১৭ এবং মৃত্যু ১৯শে জানুয়ারি ১৯০৫ । নিবাস কলিকাতা জোড়াসাঁকো । পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন । দেবেন্দ্রনাথের আদর্শে ও ছায়ায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিতে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে । তাঁর রচিত গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম, আত্মবিদ্যা, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান প্রভৃতি ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ১৯শে জুলাই ১৮৬৩ এবং মৃত্যু ১৭ই মে ১৯১৩ । উনি নদীয়া কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। পিতা দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায় । ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পাস করে বিলাতে যান, ফিরে এসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন । 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান', 'মেবারপতন', 'দূর্গাদাস', 'সীতা' প্রভৃতি তাঁহার নাট্যগ্রন্থ । তাঁহার 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্ত্র' আলেখ্য প্রভৃতি ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাতকুমারের জন্ম ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ এবং মৃত্যু ৫ই এপ্রিল ১৯৩২ । ওনার আদি নিবাস গুরুপ হুগলী । ১৯০১ খ্রীঃ উনি বিলাতে যান । ১৯০৩ খ্রীঃ ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরেন । কিছুদিন আইন ব্যবসা করার পর ১৯১৬ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক হন। ছাত্রাবস্থায় 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করেন । পরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গদ্যরচনায় হাত দেন ।

শ্রীমতি রাধামণি দেবী ছদ্মনামে কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন । তাঁর রচিত অনেক উপন্যাস ও শতাধিক গল্পের মধ্যে 'রত্নদীপ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে স্বীকৃত এবং এটির নাট্য ও চিত্ররূপও জনপ্রিয় হয় । উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ : 'অভিশাপ', 'বঙ্গকাব্য', 'গল্পবীথি', 'হতাশ প্রেমিক', ও অন্যান্য গল্প 'সিন্দুর কৌটা', 'দেশী ও বিদেশী', 'সতীর পতী', 'রমাসুন্দরী' প্রভৃতি । সরল, অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখক রূপেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ।

প্রমথনাথ বিশী

উনি ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন । উনি শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্বের ছাত্র এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-ধন্য এবং উনি কবি, নাট্যকার ও সমালোচক হিসেবে খ্যাতিমান এবং বহু গ্রন্থের লেখক । ইনি কয়েকটি প্রখ্যাত ও ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও লেখক । 'লালকেল্লা', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কেরী সাহেবের মুন্সী' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস । তাছাড়া অনেক সংকলিত গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা মূলক গ্রন্থগুলো অত্যন্ত মূল্যবান এবং নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া বহু ব্যঙ্গরচনাও লিখেছেন । উনি দীর্ঘকাল রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেছেন । কবিতা রচনার মাধ্যমেই ওনার সাহিত্য জীবনের শুরু । প্রথম কবিতার বই 'দেয়ালী' (১৯৩০) । 'বিশেষ রচনা বসন্ত সেনা' (১৯২৭) 'প্রাচীন আসামী হইতে' (১৯৩৪) 'বিদ্যাসুন্দর' (১৯৩৫) 'প্রাচীন গীতিকা হইতে' (১৯৩৭) 'হংসমিথুন' (১৯৫১) 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৭) 'যুক্তবেণী' (১৯৪৮) 'অকুন্তলা '(১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) 'উত্তরমেঘ' (১৯৫৩) এবং 'আত্মস্মৃতিমূলক শান্তিনিকেতন' (১৯৪৪) ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ওনার জন্ম ২৬শে জুন ১৮৩৮ এবং মৃত্যু ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪ ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যস্রষ্টা, ঔপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা এবং বাঙলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম প্রধান পুরুষ । ছ'বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুর গিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন । তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং কলেজের বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন । আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকার

তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর নিযুক্ত করেন । ১৮৫৮ খ্রীঃ হুগলী কলেজের ছাত্র জীবনে 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাহিত্য-চর্চায় ব্রতী হন । উনি কর্মস্থলে নির্ভীক ছিলেন ও কঠোর দণ্ডপ্রয়োগে ইংরেজ ও পুলিস কর্মচারীদের সংযত রাখতেন। প্রবল দেশপ্রেম ও ভারতীয়দের ইংরেজদের সংগে সমদর্শিতার জন্য কার্যক্ষেত্রে ওনার উন্নতি হয় নি । তাঁর প্রথম উপন্যাস '*Raj Mohan's Wife*' । ওনার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' 'ভৃতি উপন্যাস' প্রকাশিত হওয়ার পর ইংরেজী শিক্ষিত মহলে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদানের জন্য ওনার সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয় । উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্যবোধের ঋত্বিক্ ।

বকুলচন্দ্র চৌধুরী

উনি ১৯৪২ সালের ৮ই অক্টোবর পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা ডঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী । উনি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্ব বিষয়ে এম.এস.সি. পাশ করার পর সি.এস.আই.আর-এর অধীনে নেফার (অধুনা অরুনাচল) উপজাতির বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছেন । পরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডি, উপাধি লাভ করে কেন্দ্রীয় ভাষাসংস্থানের অধীনে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন । উনি ওড়িয়া ভাষায় লিখিত 'আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান প্রবেশ' পুস্তকের যুগ্ম প্রণেতা । তাছাড়া উনি কিছু গবেষণামূলক রচনাও প্রকাশ করেছেন ।

বিশু মুখোপাধ্যায়

উনি ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন । প্রধানতঃ শিশু সাহিত্য রচয়িতা । দীর্ঘদিন মৌচাক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশুবাবু বর্তমানে দৈনিক বসুমতীর ছোটদের পৃষ্ঠাটি সম্পাদনা করেন । বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবেও পরিচিত । ওনার উল্লেখযোগ্য বই 'বিখ্যাত দস্যু কাহিনী' ।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

উনি ১৯১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত বাথুয়াড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাণ্ডা। উনি কলিকাতা বিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাশ করার পর গবেষণামূলক কাজের জন্য পি.এইচ.ডি. ও পরে ডি.লিট উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন। 'কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও বাংলা গীতিকবিতার ধারা', 'সাধক কবি দ্বারিকা দাসের মনসা-মঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বিষ্ণুবাবু এন.সি.ই.আর.টির অধীনস্থ ভুবনেশ্বর রিজিওন্যাল কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচ্চ গবেষণামূলক বৃত্তি নিয়ে *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ওড়িয়া কবিদের অবদান* নিয়ে গবেষণা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ৭ই মে, ১৮৬১ এবং মৃত্যু ৭ই আগষ্ট ১৯৪১। ওনার নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, পরে শান্তিনিকেতন, বীরভুম। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্কুল কলেজের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি বটে কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মণীষা বহু অধ্যয়নে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। গল্প, উপন্যাস, ব্যাঙ্গকৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, ধর্মোপদেশ শিক্ষা, রাজনীতি, শব্দচ্ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্যকবিতা, রূপনাটক, প্রহসন, কবিতা, গান প্রভৃতি সব বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতনে কৃষি-পরিকল্পনা তাঁহার গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার উদাহরণ। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, সুরকার, নাট্য-প্রযোজক এবং স্বদেশ প্রেমিক। বিজ্ঞানে তাঁর অপরিসীম আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ এবং মৃত্যু ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮। ওনার নিবাস দেবানন্দপুর হুগলী। বাল্যকালে উনি ভাগলপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। প্রথম

জীবনে ব্রহ্মদেশে চাকুরি করতেন, পরে সাহিত্যসাধনাতেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন । তিনি বহু উপন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা । 'বড়দিদি', 'বিরাজবৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পল্লী সমাজ', 'দেনা পাওনা', 'দেবদাস', 'পণ্ডিতমশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'অরক্ষণীয়া', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন', প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ' ও 'সাহিত্য' তাঁর রচিত প্রবন্ধপুস্তক ।

শিবনাথ শাস্ত্রী

ওনার জন্ম ৩১শে জানুয়ারি ১৮৪৭ এবং মৃত্যু ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯ । ওনার জন্মস্থান মাতুলালয় চাংড়িপোতা, চব্বিশ পরগণা, পিতৃনিবাস মজিলপুর । উনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতে এম.এ. পাস করে শাস্ত্রী উপাধি পান । তাঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থ - 'পুষ্পমালা', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'হিমাদ্রি', 'কুসুম', 'ছায়াময়ী', 'পরিণয়' । 'নির্বাসিতের বিলাপ' ; উপন্যাস - 'মেজ বৌ', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে', 'যুগান্তর' এবং প্রবন্ধ পুস্তক - 'প্রবন্ধাবলী', 'ধর্মজীবন', 'রামতনু লাহিড়ী' ও 'তৎকালীন বঙ্গসমাজ' । 'আশ্বিনের ঝড়' তাঁহার 'আত্মচরিত' থেকে সংকলিত ।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের জন্ম ১২ই জানুয়ারি ১৮৬৩ এবং মৃত্যু ২রা জুলাই, ১৯০২ । ওনার পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত । উনি কলিকাতা শিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র । জেলারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি. এ. পাস করেন । উনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভারত ও ভারতের বাইরে বেদান্ত ধর্ম প্রচার করেন। শিকাগোর ধর্মসভায় স্মরণীয় ভাষণ দিয়া দেশে এসে এক সন্ন্যাসী সংঘ গঠন করেন. । তাঁর মৌলিক বাংলা গ্রন্থ 'পরিব্রাজক' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা', এবং 'বর্তমান ভারত'। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু ইংরেজী ভাষণ ও রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে ।